বাংলাদেশের রাজনৈতিক উত্থান পতন

পাকিস্তানী সাংবাদিকদের চোখে

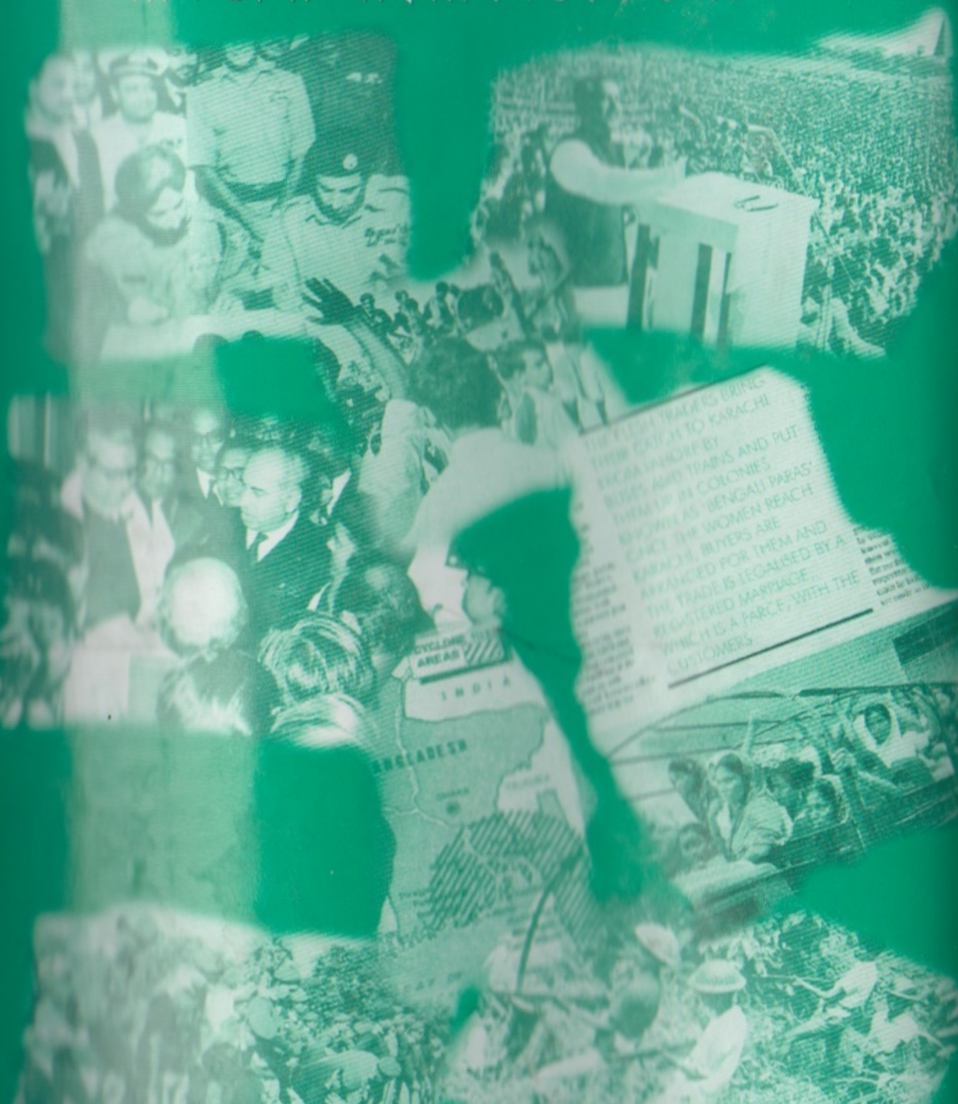

সহিদ উল্যাহ লিপন

With Compliments from

Nayeemul Islam Khan

President

Bangladesh Centre for Development,

Journalism and Communication (BCDJC)

53 Central Road, Dhanmondi, Dhaka- 1205

Tel: 8620539; E-mail:<bcdjc@citechco.net>

Web:<www.bcdjc.org>

www.pathagar.com

বাংলাদেশের রাজনৈতিক উত্থান পতন

পাকিস্তানী সাংবাদিকদের চোখে

www.pathagar.com

বাংলাদেশের রাজনৈতিক উত্থান পতন

পাকিস্তানী সাংবাদিকদের চোখে

সহিদ উল্যাহ্ লিপন

BCDJC

বাংলাদেশ সেন্টার ফর
ডেভেলপমেন্ট, জার্নালিজম এন্ড কমিউনিকেশন

www.pathagar.com

প্রকাশ কাল
একুশের বইমেলা ১৯৯৮ / ১৪০৪

প্রকাশক
বিসিডিজেসি
১৮৭ গ্রীন রোড
ঢাকা- ১২০৫

স্বত্ব
সহিদ উল্যাহ লিপন
প্রভাষক, সাংবাদিকতা বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

মূল্য
৪০ টাকা।
বিদেশে দুই মার্কিন ডলার

ISBN
984-8158-03-2

(এই গ্রন্থের আধেয়র যাবতীয় দায়িত্ব কেবল লেখকের)

www.pathagar.com

অনন্য উপহার

আমরা একাত্তরে লড়েছি পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত প্রায় এক লাখ সৈন্য, জামাত ও ইসলামী ছাত্র সংঘের ক্যাডার নিয়ে গঠিত আল-বদর এবং অগণিত রাজাকারদের বিরুদ্ধে। লড়ে আমরা প্রিয় স্বদেশকে মুক্ত করেছি বিপুল রক্ত খরচের বিনিময়ে। দেশ মুক্ত হয়েছে, ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটেছে। এই বিজাতীয় আগ্রাসী মানসিকতার বিরুদ্ধে আমাদের সুদীর্ঘ তেইশ বছর লড়তে হয়েছে। কিন্তু ইপ্সিত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরও প্রত্যাশা অতৃপ্তই থেকে গেছে। আমরা যা চেয়েছিলাম, তা যেন কখনই সম্ভব না হয়, তার জন্য একটি ঘৃণিত শক্তিবলয় মুক্তিযুদ্ধকাল থেকেই এর অভ্যুদয়ের বিরোধিতা করেছে খুন, হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন -- এমন কিছু ঘৃণিত কাজের মাধ্যমে। কিন্তু সেই শক্তি বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরও সংগোপনে তাদের চক্রান্ত অব্যাহত রেখেছে এবং একের পর এক মুক্তিযোদ্ধাদের নির্মমভাবে হত্যা করেছে। তার উপর ক্যু, পাল্টা ক্যু, রাজনৈতিক হত্যাকান্ড, ক্ষমতা ছিনতাই, স্বৈরাচার, স্বেচ্ছাচার দেশটাকে ক্রমশ ঠেলে দিয়েছে নিরাপত্তাহীনতা আর প্রগতিবিরোধী মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক চক্রের পুনরুত্থানের পথে। জনগণ আবার হয়েছে বঞ্চিত। হচ্ছে প্রতিনিয়ত। এরই মধ্যে নতুন আশার আলোকে উদ্ভাসিত আমরা। কিন্তু সে আলোও যেন ফিকে হয়ে আসছে। তরুণ শিক্ষক সহিদ উল্যাহ লিপন শিক্ষার্থী জীবন থেকেই সাংবাদিকতার অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে লেখালেখি করছেন। তার অনুভূতি কিম্বা উপলব্ধিতে রয়েছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। তাই সন্ধান করতে গিয়ে যখন বিকৃতির বিকার লক্ষ্য করেছেন ইতিহাস রচনায়, সেই মুহূর্তেই তাঁর মনে সম্ভবত উপস্থিত হয়েছে একটি সন্ধানী জিজ্ঞাসা, তা হলো, তবে পাকিস্তানী শাসকচক্রের নির্যাতন কি সেদেশের জনগণেরও সমর্থন পেয়েছে? তারাও কি দেখেছে একই দৃষ্টিতে শোষকের মতোন? ...এতো শাশ্বত সত্য : জনগণ কখনও জনগণের বিরুদ্ধে যায় না। রাজায় রাজায় যুদ্ধ করলে নলখাগড়ারই প্রাণ যায়, এই প্রবাদ সত্য হোলেও, শাসকের বিরুদ্ধে শোষকের লড়াইয়ে পক্ষের জনগণ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ যায় না। মানবিকতার অন্তর্নিহিত সৌহার্দ্যই বিভাজনের প্রাচীর তুলে বিভেদ সৃষ্টি করে। কোন না কোন ভাবে সেই বাধা প্রকাশিত হয় সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে, রাজনীতিতেও। ... পাকিস্তানে প্রগতি ধারার সৎ মানুষেরা আমাদের যুক্তিসঙ্গত দাবী পাকিস্তানের চরম পরিণতিকে মেনে নিয়ে শাসকচক্রকেই দোষারোপ করেছেন কিংবা সংকীর্ণ মানসিকতার রাজনীতিকদেরই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে সমালোচনার যুক্তি ছুঁড়ে মেরেছেন।

এমনি অভিপ্রায়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে পাকিস্তানের প্রগতিশীল জনগণ এমনকি যুক্তিবাদী বুদ্ধিজীবীরাও সমর্থন করেছেন। তাঁরা লিখেছেন, কারাবরণ করেছেন।

www.pathagar.com

নির্যাতিত হয়েছেন, তারপরও লেখায় যতি পড়েনি। এই বইতে সহিদ উল্যাহ লিপন সেইসব লেখার কিছু সংগ্রহ করে সংকলিত করেছেন। এতে দৃষ্টিভঙ্গি পাকিস্তানী হোলেও, লেখায় বর্বরতার সমর্থক সকলকে মনে হবে না। মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে জনগণের জীবন ধারণ প্রসঙ্গে তাদের সহানুভূতি মানুষকে সচকিত করেছে। এই সহমর্মিতা মানবসভ্যতারই অহংকার। তাই এই সংকলন ছোট্ট পরিসরে হোলেও আমাদের অনেক অজানা কথাই শোনাবে, এ বিশ্বাস আমার আছে। পাঁচ সাত বছর আগের লেখায় বাংলাদেশের যে মূল্যায়ন তা হয় আরো গভীর হয়েছে, নাহলে বিতর্কিত কিংবা অর্থহীন মনে হোতেও পারে। তা সত্ত্বেও, সহিদ উল্যাহ সাহসের সাথে এগুলো এক কোরে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন ইতিহাসবেত্তা, গবেষকদের ভবিষ্যত উপকরণ হিসেবে এর ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ হবে, আশা করি।

সহিদ উল্যাহ'র পরিশ্রম সার্থক হবে, যখন এই সংকলিত লেখার যথার্থ কদর হচ্ছে এটা বোঝা যাবে। কারণ এ ধরনের প্রকাশনা, বোধহয় এটাই প্রথম। তাই লেখককে আন্তরিক অভিনন্দন, এ উপহারের জন্য।

কামাল লোহানী

www.pathagar.com

সংকলন প্রসঙ্গে

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। বাঙালী জাতির জন্য শতাব্দীর সবচেয়ে বড় বেদনাদায়ক অথচ আনন্দের ঘটনা। মুক্তিযুদ্ধ ঘটে গেছে ২৫ বছর আগে কিন্তু মুক্তি হয়নি এদেশের মানুষের । যে মা সন্তান হারিয়েছেন তাঁর ভাগ্যের পরিবর্তন আমরা করতে পারিনি, যে শহীদ তার প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের জন্য জীবন দিয়ে গেছেন তাঁর আত্মার শান্তিও বোধহয় আমরা দিতে পারিনি। চারিদিকে শকুনের কালো থাবা; অশিক্ষা, দারিদ্র্য, রাজনৈতিক টানাপোড়নে স্বাধীনতার পবিত্র ইতিহাসকে নিয়ে চলছে জুয়াচুরী, সততার অভাব সবখানে এবং এক ধরনের হতাশা থেকে জন্ম নিয়েছে মিথ্যাচার আর ধ্বংস। বর্তমানে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলেও এখনো দেশ ও বাইরের শত্রুদের নীল নকশায় হত্যা, ক্যু আর ভোট ডাকাতির বাংলাদেশে সত্য বড় বিতর্কিত; তিরোহিত।

কেমন আছে বাংলাদেশ, কেমন চলছে এদেশের দিনকাল, কেমন করে পাকিস্তান ভাঙলো, বাংলাদেশ এলো, এসব নিয়ে চিন্তা করেন বর্তমান পাকিস্তানের সমাজ চিন্তাবিদ, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীরা। তাদের লেখা থেকেই জন্ম এই রচনা। ১৯৯০ এর একটি সফল গণঅভ্যুত্থানের পর পরই পাকিস্তানের *The Herald, The Nation, Dawn, The News, The Pakistan Times* প্রভৃতি দৈনিক ও সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পর্কে অনেক রিপোর্ট ও প্রবন্ধ ছাপে। যাতে পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার বহু নেপথ্য ঘটনা, বর্তমান বাংলাদেশ সম্পর্কিত বিভিন্নমুখী বিশ্লেষণ স্থান পেয়েছে। পাকিস্তানীদের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে তুলে ধরা এসব প্রতিবেদনে ইতিহাসের বিকৃতি, স্বরূপ, কিছু সত্য ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বের করে আনার প্রয়াসে বর্তমান বইটি।

উপাদান যোগাড় করেছেন পাকিস্তান প্রবাসী বন্ধু ডা: সাইফুল আলম। সংকলনের ব্যাপারে উৎসাহ যুগিয়েছেন আমার গুন্নিবাবা মুক্তিযোদ্ধা জালাল উদ্দিন ভূঞা, বন্ধুদের মধ্যে মাখন স্যার, হারুন, আব্দুল হক, সাখাওয়াত, শ্যামা, ফেরদৌস, ফাহমিদ, বন্যা, অনেকে। এ ব্যাপারে সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাই আমার অনুজ অহিদ উল্যাহ বকুলকে। তার পীড়াপীড়ি আমাকে বাধ্য করে এর কাজ শেষ করতে। ধন্যবাদ কম্পিউটার সেন্টারের মুস্তাফিজ এবং গবেষণা কেন্দ্রের কাজী জালাল ভাইকে যারা আমার অলসতার সুযোগে নিজেরা কম্পোজের উদ্যোগ নিয়েছেন।

বইটিতে ঘটনার বর্ণনা এবং নামের ব্যবহারে অত্যন্ত সচেতন থাকতে হয়েছে। যেভাবে মূল রিপোর্টে দেয়া আছে সেভাবে কাজ করেছি। পরিশেষে ধন্যবাদ জানাই বইটির

www.pathagar.com

প্রকাশক বিসিডিজেসি'র নির্বাহী পরিচালক নাঈমুল ইসলাম খান কে যিনি ঝুঁকি নিয়ে এই বই প্রকাশ করেছেন। ভূমিকা লিখে যিনি আমাকে স্নেহে আবদ্ধ করেছেন সেই কামাল লোহানীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার ভাষা আমার জানা নেই। তবে জানিয়ে রাখা ভালো বাংলাদেশের পরিস্থিতি এখন অনেক পাল্টে গেছে। তবুও বইটি যদি পাঠকের কোন উপকারে আসে বা চিন্তাধারায় নতুন কিছু সংযোজন কিংবা বিয়োজনের মাধ্যমে কিছু সত্য তথ্য উৎঘাটিত করে তবে এই শ্রম সার্থক বলে মনে করবো।

সহিদ উল্যাহ লিপন
সাংবাদিকতা বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আমার বোন রোকসানা আক্তার মুক্তা'কে,

২৯শে এপ্রিল ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ে

জল আর সাগরে যিনি একাকার।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ঢাকা: বিশ বছর পর

আজ থেকে ২০ বছর আগে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের পতনের লগ্নে পরাজিত পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ভারতীয় বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে হাজার-লক্ষ বাঙালী বিজয়ের আনন্দে নতুন মাতৃভূমি বাংলাদেশকে স্বাগত জানাতে ঢাকা সহ দেশের রাজপথে বেরিয়ে পড়লো। তারা রাস্তায় নেচে-গেয়ে, ভারতীয় সৈন্য বাহিনীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, কোলাকুলি করে, বেলুন উড়িয়ে, পটকা বাজিয়ে, আকাশে গুলি ছুঁড়ে আনন্দের জোয়ার বইয়ে দিয়েছে। সে কি আনন্দ স্বাধীনতার মদিরার স্বাদ পেয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে যেন বয়ে যাচ্ছে আনন্দের নহর। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে অবাঙালী ও বিহারীরাও সে সময় বাঙালী জনতার রুদ্র রোষের শিকার হয়েছে। বলা যায় ১৬ই ডিসেম্বরের ঘটনা বাঙালী জনগণের জন্য অনন্য একটি দিন। কেননা এই দিনেই পূর্ব-পাকিস্তানী জনগণের স্বাধীনতা অর্জিত হলো পরাধীনতার গ্লানি শেষে উঠলো স্বাধীনতার সোনালী সূর্য। প্রথম বারের মতো নিজেরা নিজেদেরে ভাগ্য নিয়ন্ত্রক হতে পারলো। নতুন স্বাধীন মাতৃভূমির নাম রাখা হলো 'বাংলাদেশ'।

আজ স্বাধীনতা দিবসের (মুক্তিযুদ্ধ) ২০ বছর পরে বিজয়ের ২১তম বার্ষিকী উদযাপন কালে বেশির ভাগ বাংলাদেশের জনগণের কাছে স্বাধীনতা দিবস তত উৎসাহ ও আত্মসমালোচনার উদ্রেক করেনি। এমনকি সাড়ে এগার কোটি বাঙালীকে এক কাতারে সামিল করতে পারেনি। স্বাধীনতার লৌহকঠিন ইস্পাত মনোবল এখন ক্রমশ যেন ক্ষয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থা এমনকি রাজনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত দুর্বিসহ ও শোচনীয় যা অতীতের এক বিন্দুও নড়েনি। শুধু তাই নয় ক্ষেত্র বিশেষে নেতিবাচকও। বর্তমান বাংলাদেশের উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ অনিশ্চিত। বন্যা, খরা, ধ্বংসাত্মক রাজনীতি, দুর্নীতি, স্বৈরশাসনের করাল গ্রাস থেকে দেশটি আজো মুক্ত হতে পারেনি। গত দুই দশকের এসব ঘটনাকে কেবল যেন স্বাধীনতাত্তোর আনন্দ নৃত্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখা চলে।

সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়। শুধু তাই নয় সেই প্রত্যয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিল বাংলাদেশের মানুষ থাকবে মুক্ত, স্বাধীন, স্ব-উদ্যোগে যার উন্নয়ন থাকবে সুনিশ্চিত। কিন্তু পরিবর্তন আজ কিছুই হয়নি। অর্থনৈতিক অগ্রগতি মন্থর, প্রায় আগের মতো। রাজনৈতিক অবস্থা বড় দুর্বিষহ, নড়বড়ে, ধবংস হয়েছে গণতন্ত্রের ভিত। সামরিক বাহিনী ক্ষমতা লোলুপ, ঠিক পাকিস্তান আমলের মতোই। জনগণও অনেকটা বিনা দ্বিধায় সামরিক শাসক ও শাসনকে মেনে নিয়েছে। জনগণ যেন

www.pathagar.com

আজ সামরিক বাহিনীর কর্তৃত্বকেই মেনে নিতে চায়। এসব নানান কারণে স্বাধীনতা যুদ্ধের স্বপ্ন, উন্নতি, অবনতি, সমৃদ্ধি যেন ছাতার নীচে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে।

আপামর বাঙালী তথা বাংলাদেশের জনগণ স্বাধীনতার স্বপ্নের বাস্তবায়ন দেখেনি। এর কারণ হিসেবে তারা দেখছে প্রাকৃতিক দুরবস্থা ও প্রকৃতির বিমাতা সুলভ আচরণ। একদিকে বাঙালীরা স্বাধীন দেশে যেমন না খেয়ে না পরে বেঁচে থাকতে রাজী নন অপরদিকে বাংলাদেশের ৯৫ ভাগ মানুষ এ ভেবে আত্মতৃপ্তি পান যে, তারা স্বাধীন ও সার্বভৌম জাতি। যেন এখানেই তাদের তৃপ্তি, শান্তি, বড় সুখ, গর্ব।

বর্তমান বাংলাদেশ সেদিনের বাংলাদেশের তুলনায় সম্পূর্ণ আলাদা। বাঙালীরা সারাক্ষণ নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাতে লিপ্ত। বহুধা বিভাজন আজকের বাংলাদেশের এক ভয়াবহ চিত্র। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা পরস্পর পরস্পরের চেয়ে সম্পূর্ণটাই আলাদা। বাংলাদেশের জাতির পিতা শেখ মুজিবর রহমানের স্বীকৃতি নিয়ে আজো বাংলাদেশ ও তার জনগণ দ্বিধান্বিত। সামরিক শাসনের সূচনা এবং ইতিহাস বিকৃতিকে এজন্য দায়ী করা হয়। সামরিক প্রশাসন, ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সম্পর্ক, স্বাধীনতাত্তোর অতিসর্ম্পক, ইসলামী মূল্যবোধ এর পুনর্জন্ম, জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গে বিতর্ক, প্রভৃতি নানান কারণে বাংলাদেশে সরকার জনগণের বহু প্রশ্নের সম্মুখীন।

বাংলাদেশের জন্মের ২০ বছর অতিবাহিত হলেও স্বাধীনতার সেই দুঃসহ ঘটনাবলী কখনো ভুলে যাবার বিষয় নয়। আবার ২০ বছর যে খুব বেশি সময় তাও কিন্তু নয়। বিষাদময় সেই ঘটনারাজি ও সিদ্ধান্তগুলোর জন্য বাংলাদেশ সৃষ্টির যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের জনগণ আজও দুঃসহ স্মৃতিগুলো মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনি। সেই গণহত্যার ফল, সামরিক বাহিনীর অমানবিক অত্যাচার, অবিচার, অভিযান, ভারতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যুদ্ধ ঘোষণা এবং সেই প্রেক্ষিতে নতুন ও স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ এর প্রতিষ্ঠা। এই তো পাকিস্তান ভাঙ্গাঁর কারণ আর বাংলাদেশ সৃষ্টির সঠিক ইতিহাস।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরে আজ পাকিস্তানের বেশির ভাগ জনগণই বুঝতে পেরেছেন যে, ১৯৭০ ও ১৯৭১ সালের পাকিস্তানী সামরিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব পূর্ব পাকিস্তানের জন্য যে পদক্ষেপ নিয়েছিল তাতে তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের স্বতন্ত্র মাতৃভূমি প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয়া ছাড়া বিকল্প কোন পথ ছিলনা। তবে পাকিস্তানের যেসব দিনের ঘটনার জন্য দুই অঞ্চলের মানুষের মনে একটি সাধারণ দুঃখ বোধের অস্তিত্ব ছিল। কেন

www.pathagar.com

পাকিস্তান ভেঙ্গে যাচ্ছে। পাকিস্তানের কোন বিশ্লেষক পূব-পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশ কেন প্রতিষ্ঠা করলো আজো তা নিয়ে কোন রকম নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ করেননি। শুধু তাই নয় ক্ষেত্র বিশেষে তারা এর সত্যানুসন্ধানে অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক ভাবে উদাসীন, নতুন গবেষকরাও পিছিয়ে আছে, এধরনের বিয়োগাত্মক বা দুঃখজনক ঘটানার জন্য কোন্ কারণ দায়ী তা অনুসন্ধানে কিংবা বিশ্লেষনে। বেশির ভাগ বাঙালীর কাছে সুখীসমৃদ্ধ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থতা দুঃখবোধের জন্ম দিলেও পাকিস্তানী শোষক গোষ্ঠিকে তাড়িয়েছে এ সান্ত্বনা তাদের কাছে বড় হয়ে প্রতিভাত হচ্ছে। তারা এখন স্বাধীন, বিদেশীদের পদানত নয় - এই সান্ত্বনা তাদের কাছে বড়।

সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালীরাই ভাবেন পাকিস্তানী শাসকদের শোষণ ও অত্যাচার সহ সব ধরনের বৈষম্যমূলক কার্যকলাপ এবং স্বৈরাচারী মনোভাব সর্বোপরি পাঞ্জাবী সেনাবাহিনী ও পশ্চিম-পাকিস্তানী শাসক দলের উৎপীড়ন বাংলাদেশ সৃষ্টিকে অপ্রতিরোধ্য করে তোলে। আশ্চর্যের, স্বাধীনতার ২০ বছর অতিক্রান্ত হতে না হতেই স্বাধীন বাংলাদেশের অধিবাসীরা সেই ইতিহাস প্রায় ভুলে যেতে বসেছে। এমনকি পাকিস্তানী সেনাশাসক ও পাকিস্তানের শোষণ তাদের অনেকের কাছে ক্ষেত্র বিশেষে বেশি প্রিয় হিসেবে প্রতিভাত হচ্ছে। সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ এখন পাকিস্তান ও বাংলাদেশের উন্নয়নের গতিধারাকে সমান্তরালে ফেলে মূল্যায়ন করতেও অনাগ্রহী। তারা জানতে চায় বাংলাদেশ হয়ে কি লাভ হলো? ক্ষেত্র বিশেষে বাঙালীরা হতাশ। পাকিস্তানের জনগণ এ ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন। তারাও সমান্তরাল ভাবে দু'টি দেশকে মূল্যায়ন করতে চেষ্টা করছে। তবে পুরনো বন্ধুদের মধ্যে আলাপ আলোচনায় সেই প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ।

বর্তমান পাকিস্তানের অভাবনীয় অগ্রগতির জন্য বাংলাদেশে কেউ কেউ অনুশোচনা করলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালীর কাছে তারা স্বাধীন এই ব্যাপারটিই মুখ্য। আবার বেশিরভাগ রাজনৈতিক প্রশ্ন বিতর্কিত রাখা হয়েছে যার যৌক্তিক সমাধান আজও করা হয়নি, ফলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যত অনিশ্চয়তার সম্মুখীন। বাঙালীর প্রশ্ন জাতির পিতা কর্তৃক প্রতিশ্রুত সোনার বাংলা আজো প্রতিষ্ঠিত হয়নি কেন, বাংলাদেশ আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে কেন অগ্রগতি লাভ করতে পারেনি, এর জন্য কারা দায়ী, আজ কেন দেশটি ধ্বংস, লুটপাট, হিংসাত্মক ঘটনাসহ স্বৈরশাসনের আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে। এই দুষ্টচক্রের মধ্য থেকে সার্বভৌম দেশটি কেন আজ অবধি বেরিয়ে আসতে পারেনি। বাংলাদেশ কি আজ প্রকৃত গণতন্ত্রের ধারায় অগ্রসর হচ্ছে, নাকি গণতন্ত্রের আড়ালে সামরিক বাহিনী কর্তৃক শাসিত হচ্ছে, স্বাধীনতাযুদ্ধে যারা নেতৃত্ব দিয়েছে তারা ক্ষমতার দ্বারপ্রান্তে নেই কেন, তার মূল কারণ কি অথবা বর্তমানে বিরাজিত সংকটজনক অবস্থান থেকে উত্তরনের জন্য যোগ্য

www.pathagar.com

নেতৃত্ব কি দেশে নেই? সবচেয়ে বড় প্রশ্নটি হলো বাংলাদেশ আজো কেন প্রকৃতির কৃপার পাত্র। জনগণ তাদের নিজের ভাগ্য কেন প্রকৃতিকে নির্ধারণ করতে দিচ্ছে। রাজনৈতিক নেতৃত্ব কি দুর্বল? এসব প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে। এর বিশ্লেষণ করলে কি দেখি। যদিও প্রায় এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলার স্বাধীনতা অর্জিত তবুও স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় থেকেই বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। স্বাধীনতাযুদ্ধে ভারতীয় বাহিনীর সহমর্মিতার জন্য প্রথম থেকেই দেখা দেয় বিভাজন। এই সহযোগিতাকে অনেক বাঙালী সামরিক অফিসারেরা মনে করে আগ্রাসন। মূলতঃ সেনাবাহিনীর এই বিভাজনের পথধরেই আসে ভিন্ন জাতীয়তাবাদের চেতনা। অপরদিকে বাংলাদেশের নীতি নির্ধারকরা ক্রমশ পাকিস্তানী সেনাশাসকদের মতো প্রতিভাত হতে থাকে। সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকজন শাসকচক্রকে বন্ধু হিসেবে নয় শাসক হিসেবে দেখা শুরু করেছে। তারা মনে করছে পাকিস্তান এবং বর্তমান বাংলাদেশের মধ্যে গুণগত কোন পার্থক্য ছিলনা এখনও নেই।

বিশ বছর পূর্বের স্বাধীন বাংলাদেশ ও আজকের বাংলাদেশ সম্পর্কটাই দুটি ভিন্ন চেহারার বাংলাদেশ। স্বাধীনতার কালে বাংলাদেশের লোকসংখ্যা ছিল মাত্র সাড়ে ৭ কোটি। কিন্তু আজ তার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১১ কোটিতে। দাতা দেশ ও এজেন্সিগুলোর কৃপার পাত্র বর্তমান বাংলাদেশ। বিদেশিরাই বাংলাদেশের ভাগ্য নির্ধারক। রাজনীতি, অর্থনীতি সবকিছুর নিয়ন্ত্রক বিদেশিরাই। স্বাধীনতাযুদ্ধে অন্যতম সহায়তাকারী ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের পূর্বের হৃদ্যতা আজ নেই। শুধু তাই নয়, এমনকি গত দুই দশকের রাজনীতি আবর্তিত হয়েছে সম্পূর্ণটাই ভারত বিরোধী। মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা আজ ভূলুণ্ঠিত হতে চলেছে। স্বাধীনতা যুদ্ধকালে বঙ্গবন্ধু ছিলেন বাঙালীর কাছে একক নেতা। অবিসংবাদিত নেতৃত্বের জন্য ছিল আওয়ামী লীগ। আজকের বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ বেশ বড় ও তৃণমূল পর্যায়ে সংগঠিত একটি সংগঠন। রাজনৈতিক দল হিসেবেও আওয়ামী লীগের রয়েছে শক্ত অবস্থান। আজ যারা বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত তারা সামরিক ছাউনি থেকে ক্যু, বিপ্লব, প্রতি বিপ্লব করে তারপর এসেছে। ক্ষেত্র বিশেষে বলা চলে শাসন ক্ষমতাকে অস্ত্রের জোরে দখল করেছে। কিন্তু অবিসংবাদিত নেতৃত্বের জন্য বঙ্গবন্ধু, রয়ে গেছেন অবিস্মরণীয়। যদিও রাষ্ট্রীয়ভাবে বঙ্গবন্ধুর নাম উচ্চারিত হয়না। এমনকি সরকারি অফিস কিংবা ভবনে তার নাম, ছবিতো নেই'ই উপরন্ত পাঠ্যক্রম থেকেও বঙ্গবন্ধু এবং স্বাধীনতা বিষয়ক পড়াশুনা বিষয়টি তুলে দেয়া হয়েছে। এমন রহস্যময় অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে বাংলাদেশের সাংবাদিক কে.জি. মুস্তাফা বলেছেন বাংলাদেশ আজ পিতাবিহীন এক জাতি।

www.pathagar.com

পাকিস্তান যেখানে ৪৪ বছর অতিবাহিত করার পরও রাজনৈতিক টানাপোড়নে পড়ে হিমশিম খাচ্ছে সেখানে অবশ্য স্বাধীন বাংলাদেশের গতি প্রকৃতি নিয়ে ২০ বছরের ঘটনাকে সঠিক মূল্যায়নের ঠিক সময় এটি নয়। তাছাড়া বাংলাদেশের ট্রাজেডি এতো সহজে ভুলবারও নয়। পাকিস্তানী সৈন্যের ব্যাপক ধবংসযজ্ঞের পরও অত্যন্ত স্বল্প সময়ের মধ্যে দেশ পুনর্গঠনে বাংলাদেশ অত্যন্ত দ্রুততরভাবে এগিয়েছে। প্রায় ১৩ লক্ষ লোক হয়েছেন গৃহহারা তবে তারা এই ভেবে সান্ত্বনা পেতো যে দেশ স্বাধীন হলে সুখ সমৃদ্ধি আসবে। আজ আওয়ামী বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো স্বাধীনতার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে না পারার জন্য আওয়ামী লীগকে দায়ী করেন। এ সম্পর্কে বাঙালীদের ধারণা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মারাত্মক একটি ভুল বাকশাল পদ্ধতিতে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা পত্তন। তাছাড়া রয়েছে স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতাকারী দালালদের ক্ষমা। সাংবিধানিক ভাবে বাকশালের স্বীকৃতি বেশিরভাগ বাঙালী মেনে নেয়নি। সেনাবাহিনীও এরকম একটি সিদ্ধান্তে মারাত্মক ক্ষুব্ধ হয়। তারা আওয়ামী লীগকে সমূলে উৎপাটনের জন্য আক্রমণ করে বঙ্গবন্ধু ভবন, হত্যাকরে বঙ্গবন্ধুকে, তাঁর পরিবারের অনেক সদস্যকে। বিভিন্ন ঘটনায় প্রমাণ আন্তর্জাতিক একটি এজেন্ট এই হত্যার জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী। শেখ মুজিবের হত্যা বাংলাদেশের রাজনীতিতে হত্যা, ক্যু এসবের রাজনীতি প্রবেশ করিয়ে দিল। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের সাড়ে ৪ বছরের মাথায় এই হত্যাকান্ড যেন স্থায়ীভাবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ধারায় স্থান করে নিল। এই হত্যাকান্ড জাতির জনককেই শুধু নিশ্চিহ্ন করেনি, উপরন্ত অবিসংবাদিত নেতা ও নির্বাচিত জনপ্রিয় সরকারের এহেন দুঃজনক হত্যাকান্ড স্বাধীনতার সময়কার সাধারণ জনগণের প্রত্যাশা আর আকাঙ্খাকে ধুলিস্মাৎ করে দিল। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর রাজনৈতিক হামলা, হত্যা, পাল্টা হত্যা ও অভ্যুত্থান ইত্যাদি পুরো রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো ভেঙ্গে দিল। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে দুটি জনপ্রিয় সরকার (একটি শেখ মুজিব ও অন্যটি জিয়ার)কে হত্যার মাধ্যমে উৎখাত করা হলো। দুই দুই বার স্বৈরতন্ত্র বা সামরিক শাসন জারি করা হলো, ষড়যন্ত্রের মধ্যদিয়ে বহু সামরিক অভ্যুত্থানের চেষ্টা চললো। মোট কথা সার্বিক বিচারে বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতা দখলে কিংবা রাজনৈতিক ক্ষমতা কুক্ষিগত করার ক্ষেত্রে 'উর্দি' পোষাকধারিরা এগিয়ে রয়েছে।

বাংলাদেশের আজকের রাজনৈতিক মেরুকরণকে ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে বিচারের চেষ্টা চলছে। সমাজতত্ত্ববিদ, বুদ্ধিজীবীরা এই চিন্তার অগ্রভাগে। কারো কারো মতে একদল ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শধারী যারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সমর্থন করে এবং বাঙালী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করে। অন্যদল যারা ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাস করে, বাঙালী জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করে। যার কারণ ভারতের

www.pathagar.com

পশ্চিম বাংলা থেকে নিজেদের আলাদা করার প্রত্যয়। অন্যদল আছেন যারা '৭৫ পূর্বের আদর্শে বিশ্বাসী এবং '৭৫ এর পরের আদর্শে বিশ্বাসী। '৭৫ পূর্ববর্তী আদর্শে বিশ্বাসীদের ধারণা, পাকিস্তানী সম্পর্ক ও আমলাতান্ত্রিক শাসক ও শোষকের বিরুদ্ধে তারা ২৫ বৎসর সংগ্রাম করে ৯ মাস রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে নূতন সোনার বাংলা তথা বাংলাদেশ গড়েছে। মোট কথায় বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রকৃতি আজ দুটো ধারায় বিভক্ত। একটি হলো আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে, অন্যটি হলো ক্ষমতাসীন বিএনপি'র নেতৃত্বে। যাদের মধ্যে স্বাধীনতাবিরোধীরাও রয়েছেন। আওয়ামী লীগের মূল আদর্শের মধ্যে রয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতা, বাঙালী জাতীয়তাবাদ ও ভারতের প্রতি সহানুভূতি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন ভারত আওয়ামী লীগকে স্বাধীনতা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে সহায়তা করেছিল। অন্য দলটি হলো সামরিক প্রধান হিসেবে ক্ষমতাসীন থাকাকালীন মেজর জিয়াউর রহমানের সৃষ্টি, যারা বাংলাদেশের আপামর জনসাধারনের হৃদয় জয় করতে পেরেছে। শেখ মুজিবর রহমানের গগনচুম্বি জনপ্রিয়তাকে দ্বিধাবিভক্ত করতে পেরেছে। এমনকি কিছু কিছু ক্ষমতালিপ্সু সামরিক বাহিনীর সদস্য গণতন্ত্রের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ শুরু করে সামরিক শাসনকে সমর্থন জানিয়েছে। ভারতের প্রতি সমর্থন মুজিবের জনপ্রিয়তাকে খর্ব করে দিয়েছে। মুজিবের ভাল-খারাপ যে কোন সিদ্ধান্তকে তারা ভারতের বুদ্ধিতে এবং ভারতের স্বার্থে করেছে এই দোহাই দিয়ে ব্যাপক জনসমর্থন আদায় করেছে।

বাংলাদেশের জনগণের কাছে ধর্মনিরপেক্ষতা ও বাঙালী জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা না দেয়া, বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা হ্রাসের অন্যতম একটি কারণ। বাংলাদেশের বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ ডঃ এনামুল হককে দিয়ে বাংলাদেশের বাঙালীকে চিহ্নিত করতে যে বোর্ড গঠিত হয় তাতে তিনি বাংলাদেশের পাসপোর্টে বাঙালীকে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ পরিচয় করানোর সুপারিশ করেন। সেই সুপারিশে বাঙালী জাতীয়তাবাদের চেতনাকে একবারে অস্বীকার করা হয়। স্বাধীনতার পর পরই আওয়ামী সরকার ধবংসপ্রাপ্ত উৎপাদমুখী সকল শিল্প কারখানাগুলো পুন: উৎপাদনের জন্য জাতীয়করণ করে ফেলে। কিন্তু আজ দেখা যাচ্ছে পুর্নগঠনের পর চুরি লুটপাটের কারণে তা আবার ধ্বংস হতে যাচ্ছে। এর জন্য আওয়ামী সরকারের অদূরদর্শী জাতীয়করণ নীতি, ব্যর্থ ও দূর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসনই দায়ী। নতুন দেশটিতে যেখানে শিল্পায়ন ছিল জরুরি, জাতীয়করণের ভীতির কারণেই নব্য পুঁজিপতিরা সেখানে শিল্পস্থাপনে আর আগ্রহী হয়নি।

বঙ্গবন্ধু মুজিবের সবচেয়ে বড় ভুল প্রশাসনে ক্ষমতার দ্বৈত বন্টন, বিশেষত সামরিক ক্ষেত্রে রক্ষীবাহিনী ও সামরিক বাহিনী গঠন। এই কারণে সামরিক কর্মকর্তা বিশেষ করে যারা পাকিস্তান সেনাবহিনীর বিরুদ্ধে মরনপণ যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন তাদের ধারণা হলো

www.pathagar.com

মুক্তিবাহিনীর কাছে তাদের ভূমিকা যেন ম্লান হতে চললো। তাই শেখ মুজিবের হত্যাকান্ড ও আওয়ামী লীগের পতনের জন্য আজো রক্ষী বাহিনীকে দায়ী করা হয়। এজন্যই দেশবাসীর কাছে আওয়ামী লীগ সমালোচিত। মুজিবের মৃত্যুর অন্যতম কারণ বাকশাল পদ্ধতি যার পুরো নাম, বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ। এই বাকশালের কারণে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি নিষিদ্ধ হয়ে যায়। কেবল তাই নয়, বিরোধী দলগুলো এবং আপামর জনসাধারণ এই সিদ্ধান্তে হতবাক হয়ে পড়ে, বিরোধিতা করে। জনগণ এ পর্যন্তও ভাবছিল বাকশাল বোধহয় গণতন্ত্রের কবর রচনা করলো। তাই বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অবিসংবাদিত নেতৃত্ব দানকারী আওয়ামী লীগকে অত্যন্ত দুঃখজনক ভাবে হত্যাকান্ডের মধ্য দিয়ে ক্ষমতাচ্যুত হতে হলো। এই পতনের ফলেই বাঙালীর অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিব ও মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধের ঘাপটি মেরে থাকা প্রতিক্রিয়াশীল দল রাজাকার পুনরায় অত্যন্ত উলঙ্গভাবে মুজিবের বিরোধিতায় লিপ্ত হলো। সামরিক বাহিনী হয়ে পড়লো দ্বিধাবিভক্ত। কেউ গেল স্বাধীনতার পক্ষে আবার কেউ বিপক্ষে। বিশ্লেষকদের মতে, সামরিক বাহিনীর এই বিভক্তি তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত, ব্যতিক্রম নেই। সামরিক বাহিনীর এই বিভক্তি রাজনৈতিক নেতৃত্বকে শংকিত করে তোলে। ফলে দেশজুড়ে বিরাজ করতে থাকে হতাশা যার মাঝে জন্ম নেয় দূর্নীতি, লুটপাট, বিশৃঙ্খলা। যাকে রোধ করা কারো পক্ষে অন্তত ঐ মুহূর্তে সম্ভব ছিলনা। যে সামরিক বাহিনী মুক্তিযুদ্ধে জনগণের পক্ষে দেশমাতৃকার টানে লড়েছিলো তারাই এই মুহূর্তে ক্ষমতালোভী হয়ে উঠলো। রাতারাতি তাদের ভালবাসা পরিবর্তিত হলো ক্ষমতা দখলের রাজনীতিতে। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ এতে বিস্মিত হলো। ভয়ে বলেনি কিছু। এর মধ্যে যে সব সামরিক অফিসার ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেনি তারাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে যাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল পাকিস্তানী উচ্চপদস্থ আর্মি অফিসারের মতোই। এর ফলে মুক্তিযোদ্ধা সামরিক অফিসারের মধ্যে ধারণা পাল্টাতে লাগলো এবং এই পরিবর্তন বলতে গেলে অতি অল্প সময়ে। সেই ভাঙ্গন রোধ করা আর কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না। অনেক উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসার তা স্বীকার করেন। যার পরিণতি আজকের বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিরাজমান।

নতুন স্বাধীন দেশে সামরিক বাহিনীর চেতনা পরিবর্তনের এই ধারা ১৫ই আগষ্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নৃশংস হত্যার মধ্য দিয়ে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো। এর পরের ইতিহাসে ঘটলো অভ্যুত্থান ও পাল্টা অভ্যুত্থান। যার মধ্যদিয়ে জিয়াউর রহমান সফলভাবেই গণতন্ত্রের স্থলে সামরিক শাসন জারি করে রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করলো। যদিও সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্যদিয়ে জিয়াউর রহমান শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলো তবুও তিনি মানুষের কাছে পূর্বে সম্পূর্ণটাই অপরিচিত ছিলেন তা নয়। মুক্তিযুদ্ধে

www.pathagar.com

তিনি চট্টগ্রামে জেড ফোর্সের নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি তখন ছিলেন মেজর। সে সময় বাঙালী অফিসার ও জওয়ানদের মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়ার আহবান জানিয়েছিলেন। তাতে কাজও হয়েছে প্রচুর। সামরিক বাহিনী তখন জিয়াউর রহমান থেকে যোগ্যতর কাউকে মনে করলো না বরং তাকে ক্ষমতারোহণে সহযোগিতা করলো। মূল যিনি সাহায্যকারী ছিলেন তিনি ছিলেন একজন আহত মুক্তিযোদ্ধা ও অবসর প্রাপ্ত কর্নেল। তার নাম তাহের। জিয়া জনপ্রিয়তা পেলেন প্রচুর. এই সমর্থন থেকেই জিয়া আওয়ামী স্রোত বিরোধী একটি রাজনৈতিক দল গড়ে তোলার চেষ্টা করলেন. সফলও হলেন। বিএনপি নাম দিয়ে দলগঠন করলেন তিনি, দলে ভিড়ালেন আওয়ামী লীগের মাঠ পর্যায়ের নেতাদের যারা দ্বিতীয় সারির আওয়ামী লীগ নেতা ছিলেন।

জিয়াউর রহমান একান্তই জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেম বোধে বিশ্বাসী। তবুও তিনি সামরিক বাহিনীর গোয়েন্দাদের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠা করলেন বিএনপিকে। একজন প্রাক্তন সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা- ডিজিএফআই কর্মকর্তা জানালেন একথা। পাকিস্তানের আই,এস,আই এর মতো তাদের নির্দেশেই বাংলাদেশী জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত হলো। এই স্পর্শকাতর বিষয়টি সাধারণ জনগণকে বুঝিয়ে বলা হলো বাংলাদেশের নাগরিকরা ভারতের বাঙালীদের চেয়ে আলাদা জাতি। একই সঙ্গে ভারত বিরোধী জনমত গড়ে তুলতে লাগলো ইসলাম ও হিন্দু এ ধরনের বিভক্তির মাধ্যমে। ডিজিএফআই এর সেই অফিসারদের মতে. অনেক জনগণই এ কারণে নতুন পার্টি বিএনপিতে যোগ দিল। শুধু তাই নয়, তারা আওয়ামী লীগের তীব্র বিরোধিতায় নামলো। একই সঙ্গে ভাঙ্গা মুসলীম লীগ ও ভাসানী ন্যাপের অনেক নেতা বিএনপিতে যোগদিয়ে বিএনপিকে শক্তিশালী রাজনৈতিক দলে পরিণত করলো। নতুন গঠিত বিএনপি অত্যন্ত সুকৌশলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের ভারত বিরোধী মনোভাবকে কাজে লাগিয়ে বিরাট জনগোষ্ঠীর সমর্থনকে নিজেদের পক্ষে আনতে চেষ্টা করলো। তারা প্রচার করতে লাগলো আওয়ামী লীগ ইসলাম বিরোধী এবং ভারতের তাবেদার। এজন্যই মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গীকার জাতীয় চার মূলনীতি- ধর্ম নিরপেক্ষতার বদলে সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণবিশ্বাস করা হলো। বাঙালী জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে করা হলো বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ। অবশ্য বাংলাদেশী শব্দটি ৭৯তে বেড়াতে আসা ভারতের এক পত্রিকা সম্পাদক প্রথম ব্যবহার করে। তার এই ব্যবহারের কারণ ছিল বাংলাদেশকে ভারত উপমহাদেশ থেকে আলাদা করে পরিচিতি দেয়া। বিএনপি এই তত্ত্বটি লুফে নেয় এবং প্রচার করতে থাকে জোরে সোরে - উদ্দেশ্য সার্বভৌম বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক ভাবে পরিচিত করা এবং আওয়ামী লীগের গগনচুম্বী জনপ্রিয়তাকে খর্ব করা। এর পর জিয়ার প্রতিষ্ঠিত বিএনপি সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে এরশাদ সরকার ক্ষমতায় এলো। তাও ব্যাপক জনসমর্থন আদায়ের মাধ্যমে ।

www.pathagar.com

এরশাদ সরকার এসে জনগণের ধ্যান ধারণাকে অনেকটা বিকৃতভাবে পরিবর্তন করতে লাগলো। ১৯৭১ সালে যে বাঙালী ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাতে হাত রেখে এক সঙ্গে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়েছে, বিজয়ের মুহূর্তে আলিঙ্গন ও চুম্বন করেছে তাদের, এমনকি জনসমর্থনের অন্যতম দলিল ভারত তথা ইন্দিরা সরকারের সঙ্গে শেখ মুজিবের ২৫ বছরের মৈত্রী চুক্তিকে আক্রমণ করা হলো। এগুলো আওয়ামী লীগের জন্য হলো হিতে বিপরীত। মৌলবাদী জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় পার্টি সেই আক্রমণের অন্যতম দাবীদার। নব ক্ষমতাচ্যুত দল বিএনপি মধ্যপন্থী থেকে গেলো। অপরদিকে কমিউনিস্ট পার্টি সহ কিছু ক্ষুদ্র বামপন্থী দল বিএনপি ও জাতীয় পার্টির ভারত বিরোধী এই ধারাকে স্বাগত জানালো। ব্যবসায়ী মহলের ধারণা হলো ভারতের সাথে সম্পর্ক রাখলে চোরাকারবার বেশ জমে উঠবে, যা নূতন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের শিল্প উন্নয়নকে ব্যহত করবে। অন্যদিকে ভারতের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ধারা এমন একটি পর্যায়ে গিয়েছিল চরম বামপন্থী নেতা বিশেষত কমিউনিস্ট পার্টি নেতা সাইফুদ্দিন মানিক, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি নেতা অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ এই প্রসঙ্গে বলেন, ভারত অত্যন্ত সুচতুরভাবে ঐতিহাসিক ধারায় ঔপনিবেশ প্রক্রিয়ায় এক ধরনের প্রভাব বিস্তার করতে সব সময় ছিল সচেতন। ফলে ভারত বিরোধী ক্রমবর্ধমান স্রোত ইসলামী দেশ হিসেবে পাকিস্তানের প্রতি ঝুঁকে পড়ার একটি প্রবনতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বাঙালীরা ভাবছে বাংলাদেশ ভারতের জন্য ভিন্ন একটি পাকিস্তান। অন্ততঃ ভারতের আচরণে তাই প্রমাণ করে। সাইফুদ্দিন মানিক বলেন, "বাংলাদেশের সামরিক কর্মকর্তারা প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে জনগণের এই অনুভূতিকে কাজে লাগিয়ে শাসন ক্ষমতা দখল এবং সেই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে চায়।" বিশ্বের প্রায় প্রত্যেক অঞ্চলে প্রত্যক্ষ স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন ও আন্দোলন প্রক্রিয়ার স্রোতের কারণে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এসব অঞ্চলে পরোক্ষ স্বৈরাচারের নিয়ন্ত্রণই চলছে। সহজ সরল মানুষের ধর্মীয় আবেগকে পুঁজি করে ক্ষমতাসীন বিএনপি নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করেছে একথাও বলেছেন মোজাফফর আহম্মদ। সামরিক শাসকরা সব সময় ক্ষমতারোহণ করে এবং নিজের ভাবমূর্তি বৃদ্ধির জন্য তৃণমূল পর্যায়ের লোকজনদের সমর্থন আদায়ের চেষ্টায় লিপ্ত থাকে তা অনেকটা গণতন্ত্র, নির্বাচন এবং টাকার মুলো ঝুলিয়ে। "বিএনপি, সামরিক ছাউনির জন্ম," এই মন্তব্য করেছেন মানিক। যখন জিয়া পুরো দেশের জনগণ ও সামরিক বাহিনীকে বোঝাতে শুরু করেছেন যে, তিনিই একমাত্র সর্বময় ক্ষমতার মালিক। এটি করতে গিয়েই হয়েছে আবার অভ্যুত্থান এবং এরশাদের ক্ষমতারোহণ। যিনি সামরিক স্বৈরাচার হিসেবে ৯ বছর দোর্দন্ড প্রতাপে বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। এবং খুব সম্প্রতি ব্যাপক গণআন্দোলনের মুখে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। যার অগ্রসৈনিক ছিলেন ছাত্র, শিক্ষক, পেশাজীবি বিশেষত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র - বুদ্ধিজীবীরা। এরশাদের দীর্ঘদিনের ক্ষমতার কারণ

www.pathagar.com

ছিল সামরিক বাহিনীর ঐক্য। যদিও অভ্যুত্থানের সময় সেই ঐক্যে ভাটা পড়ে। সাবেক স্বৈরশাসক এরশাদ বেআইনী ও অবৈধ ক্ষমতাভোগ করার কারণে এখনো জেলখানায় বন্দী। অন্যদিকে বিএনপির বিজয়ে আওয়ামী লীগ হতবাক। আওয়ামী লীগ নেতারা নিজেদের সাংগঠনিক দুর্বলতা নিয়ে সমালোচনা ও উপদলীয় রাজনীতিতে রত। নিজেদের ব্যাপারে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ সমর্থকরা অত্যন্ত কঠোর। বিশেষত নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র দূরত্ব লক্ষ্য করা গেছে। এই মন্তব্য করে তিন জোটের রূপরেখার কথাগুলো মোজাফফর আহম্মদ উল্লেখ করেছেন। অবশ্য সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় গণতন্ত্রে ফিরে যাওয়ার জন্য আওয়ামী লীগের ইতিবাচক ভূমিকা জনগণ বেশ প্রশংসার সঙ্গে গ্রহণ করেছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

তারপরও রয়েছে হাজার সমস্যা। বিশেষত ক্ষমতাসীন বিএনপি সরকারের নানান শঙ্কা ও দুর্বলতার কারণে অগ্রগতির চাকা অত্যন্ত ধীর। গণতন্ত্র ও সংসদীয় গণতন্ত্রের পরিপ্রক্ষিতে মুজিব হত্যাকান্ডের বিচার না হওয়ার একটি কালাকানুন ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল করা হয়নি। এ কারণেই আওয়ামী লীগের সাথে ক্ষমতাসীন বিএনপি'র সম্পর্ক ক্রমাগত দূরে চলে যাচ্ছে। ঢাকার পর্যবেক্ষক মহল ও রাজনৈতিক দল সহ সচেতন জনগণ মনে করছেন বিএনপি সরকারকে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সমুন্নত রাখতে হলে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিলের ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ-বিএনপি'র সুস্পষ্ট মতামত চেয়েছে। কিন্তু দুই দলের মধ্যে বিরাজমান মৌলিক দূরত্ব আজও সামান্যতম কমেছে- একথা জোর গলায় বলা দুরূহ। বিএনপি ও আওয়ামী লীগের সম্পর্ক যেন জমাট বাধা বরফ। বিএনপির স্থানীয় ও পল্লী উন্নয়ন, সমবায় মন্ত্রী এবং দলের সেক্রেটারী জেনারেল আব্দুস সালাম তালুকদার তার এক সাক্ষাৎকারে আওয়ামী লীগের ইনডেমনিটি বিল সম্পর্কে সমঝোতার বিষয়টি সরাসরি অস্বীকার করে যান। পত্রিকার একই সাক্ষাৎকারে তিনি সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করেন আওয়ামী লীগের সাথে কোন আপোষ নেই, এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ দূরের কথা। এমনকি তিনি আওয়ামী লীগকে জাতীয় পার্টির সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন, "আমরা জাতীয় পার্টির উপজেলা পদ্ধতিকে যেমন নিরবে বাতিল করে দিয়েছি। তাতে আওয়ামী লীগও প্রায় বাতিল হয়ে গেছে। কেননা জনগণ স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃত্বকে প্রত্যাখ্যান করেছে।"

স্বাধীনতার বিশতম বার্ষিকী যখন পালিত হতে যাচ্ছে তখন জনগণ স্বাধীনতার অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়, বর্তমান বাংলাদেশের প্রকৃত আদর্শ কি হতে পারে এই নিয়ে বিভিন্নমুখী চিন্তা-ভাবনা করছে। বিএনপি সরকার খোলাবাজার নীতি প্রণয়ন করে এই প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করলেও দেশটি যে অতিশীঘ্রই শিল্প সমৃদ্ধ হবে একথা বলা দুষ্কর। এর কারণ

www.pathagar.com

ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অধ্যাপক মোজাফফর আহম্মদ বলেন, "যতোদিন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি সামরিক শাসনের পক্ষে থাকবে ততোদিনই শিল্প উন্নয়ন অগ্রসর হবে না। এই ভেবে কেউ শিল্প উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেনা। অর্থনৈতিক সমস্যার দুষ্টচক্র এবং রাজনৈতিক অপপ্রচারের আবর্তে সবাই মুক্তিযুদ্ধে কার ভূমিকা কি ছিল এই নিয়ে সবাই জনসমর্থন আদায়ের চেষ্টা চালাচ্ছেন।" এ থেকে আমরা সুনিশ্চিত যে, পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ও তদানীন্তন পশ্চিম-পাকিস্তানী রাজনীতিবিদদের হঠকারীতা মূলক সিদ্ধান্ত বাংলাদেশ সৃষ্টির অন্যতম কারণ। বাঙালী নেতৃত্বও এই সিদ্ধান্ত থেকে পিছু হটতে পারছিলনা। কেননা শেখ মুজিবের অবিসংবাদিত নেতৃত্বে জনগণের চেতনায় বাঙালী জাতীয়তাবাদের যে জোয়ার এসেছিল সেই গণজোয়ারই বাংলাদেশ সৃষ্টির ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। আবার অন্য একদল বলেন, ভারতীয় চক্রান্তে বাংলাদেশ সৃষ্টি করা হয়েছে, যার উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানের শক্তি খর্ব করা। অন্যদিকে ব্যবসায়ী বুর্জোয়া শ্রেণী জাতিকে অগ্রসর করে নিতে নিরন্তর বহু সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। কিন্তু আজ বিশ্ববাসীর চিন্তা সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালীর চিন্তা প্রাকৃতিক বিপর্যয়, রাজনৈতিক হত্যাযজ্ঞ ও নানান টানাপোড়ন সত্ত্বেও ২০ বছরের বাংলাদেশ শুধু হতাশার মধ্যে থাকবে তাই কেবল নয়। হতাশা পেরিয়ে বাংলাদেশ আজ গণতন্ত্রের বন্ধুর পথে যাত্রা শুরু করেছে। গণতন্ত্রের এই যাত্রা শুভ হলে বাংলাদেশ উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাবে যা নিশ্চিত করে বলা চলে।

দি হেরাল্ড, ডিসেম্বর '৯১
জাফর আব্বাস

www.pathagar.com

ভিন্ন বাংলাদেশ: ভিন্ন অতীত

স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের চেহারা বহুবার পাল্টিয়েছে। সাবেক পশ্চিম পাকিস্তানের চিত্রের মতোই বাংলাদেশে সবকিছুই ভয়াবহ আলো আর আবছা অন্ধকারে ঢাকা। ঢাকার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতা অধ্যাপক মোজাফফর আহম্মদ এর বাড়ীতে যখন ঢোকা হচ্ছে তখন দেখলাম-ছিমছাম বাড়িটির ড্রইংরুমে কিছু বই আছে। 'প্রতিবেদক' এই পরিচয় দিতেই তিনি জিজ্ঞেস করেন, সুবহু গ্যানচেংডানীকে চিনি কিনা, তিনি তাঁর পুরনো বন্ধু। কথায় কথায় তিনি জানালেন আজকের বাংলাদেশের রাজনীতি এতাই জটিল ও দুরূহ হয়ে পড়েছে যা পাকিস্তান আমলের দুর্বোধ্য রাজনীতির চক্রের চেয়েও ধুরন্ধর ও জটিল। তিনি আরো জানালেন, পাকিস্তান থেকে কেউ তার কাছে আসলে তিনি সেকালের বন্ধু ও রাজনৈতিক সতীর্থ ওয়ালী খান, জামাল নাদভী সহ প্রায় পরিচিত সবার খোঁজ খবর নেন। মোজাফফর আহম্মদ বাংলাদেশেই নয়, সাবেক পাকিস্তানেও ছিলেন বিখ্যাত বামপন্থী রাজনীতিবিদ। কোন পাকিস্তানী তাদের সঙ্গে দেখা করতে আসলেই তারা পুরনো গল্প শুরু করেন। দুই পাকিস্তান বিভক্ত হয়ে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর আজ বিশ বছর অতিক্রম করেছে। সত্যিই বাংলাদেশ সৃষ্টির জন্য ৫৮ থেকে ৭১ এর স্বৈরাচারী শাসন প্রকৃতই দায়ী, অবশ্য বামপন্থী কিছু শক্তিকেও পাকিস্তান ভাঙ্গার জন্য দায়ী করা যায়। অথচ স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস আপামর বাঙালীর কাছে যেন কিছু নয়, কেবলমাত্র রক্তঝরা ক'টি দিন। স্বাধীনতার ২০ বছর অতিক্রান্ত হলেও বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে বিরাজমান কিছু সমস্যার আজো কোন সুরাহা হয়নি। বাংলাদেশে ৬০ টিরও অধিক জেনেভা ক্যাম্প রয়েছে, যেখানে প্রায় আড়াই লক্ষ বিহারী বাস করছে। অতীতের সুখকর দিনযাপনের চেয়েও বাঙালীরা মনে করে তাদের গৌরব, মুক্তিযুদ্ধ, সংগ্রাম, স্বাধীনতা আন্দোলন, রক্তদানের কথা এবং তা অত্যন্ত গভীর ভাবে। তারা মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ে গৌরববোধ করে, অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করে সাংবাদিক কে.জি.মুস্তফা আমাকে আসমী, জামাল জেহাদী, হুসেইন নকী এদের কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন। পাকিস্তানের সময় কালে তারা ছিলেন দৈনিক সানডে'স কিংবা মর্নিং নিউজ এর সাংবাদিক, সতীর্থ কর্মী।

বর্তমান বাংলাদেশের নবীন সাংবাদিকরা পাকিস্তানের ক্রিকেট সম্পর্কে খোঁজখবর রাখেন। তারা ইমরান খানের খুব প্রশংসা করেন। এমনকি ইমরান খানের নানান বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। বিশ্বকাপের খবরও তারা খুব বিস্তারিত দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করেন। এক ব্যবসায়ী আমাকে বলেই বসেছেন চট্টগ্রামের একই স্কুলে পড়া তার দুই ব্যবসায়ী বন্ধুকে আমি চিনি কিনা, তারা হলেন এলাহী ব্রাদার্স। মাঝ বয়েসী একজন রিক্সাচলক আমাকে

www.pathagar.com

নাদিম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে বলেন, "ফিল্মস্টার নাদিম এখনো শাবানার মতো চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন কিনা? তার বয়স কতো ? বুড়ো হয়েছেন" ইত্যাদি। রাজনীতিবিদ থেকে শুরু করে রিক্সাওয়ালা প্রায় সবাই জিজ্ঞেস করলেন, বেনজীর ভুট্টো কেন ক্ষমতা থেকে আউট হলো, তিনি কি খুব শিগগীর ক্ষমতায় যাবেন।

স্বাধীনতার পর থেকে ঢাকার পরিবর্তন হয়েছে দেদার। কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবর্তন কল্পনাতীত, পরিবর্তন গুলোতে প্রতিষ্ঠান, শপিং কমপ্লেক্স অন্যতম। নতুন পার্ক হয়েছে বেশ ক'টি, বেশকিছু রাস্তা তৈরি হয়েছে, সর্বোপরি মসজিদের শহর ঢাকায় তৈরি হয়েছে কিছু সুদৃশ্য মনোরম মসজিদ। ঢাকায় সাইকেল রিক্সার পরিমাণ এতোই বেড়েছে মনে হবে ঢাকায় রিক্সা ছাড়া আর কিছুই নেই। আর রিক্সাচালকরাই বোধহয় ঢাকা নগরীর নায়ক কিংবা রাজা। সরকারি মতে ঢাকায় দুই লক্ষের বেশি রিক্সা রয়েছে। বেশির ভাগ রাস্তায় ৭০ শতাংশ জুড়ে থাকে রিক্সা এবং রিক্সাওয়ালা। ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল হয়েছে এখন শেরাটন। রাজনৈতিক কোন ইস্যু থেকে নয়, কেবল মাত্র মালিকানার পরিবর্তনে এই ঘটনা। বাংলাদেশের এই হিসেবে চিহ্নিত করার জন্যই কোন কোন ভবনের নূতন নামকরণ করা হয়েছে। যেমন জিন্নাহ এভিনিউকে করা হয়েছে বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, কায়েদ-এ-আজম কলেজ এর নাম করন করা হয়েছে সোহরাওয়ার্দী কলেজ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিন্নাহ ও ইকবাল হলকে করা হয়েছে সূর্যসেন ও সার্জেন্ট জহরুল হক হল। এই দুই বাঙালী ছিলেন স্বাধীনতার অগ্রসৈনিক। পুরাতন রেসকোর্স ময়দানের নাম দেয়া হয়েছে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান। মগবাজারের আদমজী হাউসকে এখন বলা হচ্ছে গভর্ণমেন্ট হাউস, বাওয়ানী হাউসকে করা হয়েছে চীনা দূতাবাস এবং কোহিনুর ভবনকে করা হয়েছে ভারতীয় দূতাবাস।

বাংলাদেশে স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন অন্যান্যের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানী শিল্পপতি ইস্পাহানী এমনকি বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবার পরও বাংলাদেশে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তারা আজকের ঢাকার অন্যতম এলিট হিসাবে স্বীকৃত। এ ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানে কিছু কিছু ক্ষুদ্রব্যবসায়ীদের মধ্যে যারা বাংলাদেশে থেকে যায়, তারাও এখন প্রতিষ্ঠিত শিল্পপতি। ভারতীয় বংশোদ্ভুত একজন পাকিস্তানী লোক মন্তব্য করলেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় বাঙালী জনগণের কাছ থেকে বেশ সাহায্য সহযোগিতা পেয়েছি ফলে আমাদের থেকে যাওয়া ছাড়া অন্য সিদ্ধান্ত নেয়ার ইচ্ছে হলোনা। শুধু তাই নয়, আমরা অনেক পাকিস্তানীকে বাংলাদেশের নৈতিক স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে বাংলাদেশেই থেকে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছি। এবং তারা সেই অনুরোধ রক্ষা করেছেন, থেকে গেছেন বাংলাদেশে। ঢাকার বর্তমান চিত্রের অন্যতম একটি দিক হলো উর্দু বা ইংরেজীর বদলে সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার। অফিস-আদালত সহ প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের সাইনবোর্ড

www.pathagar.com

বাংলায় লিখা। বাঙালী একটি স্বাধীন জাতি, এর একটি স্বতন্ত্র পরিচয় রয়েছে এটি প্রমাণ করার লক্ষ্যে দেখা যায় জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের মাত্র কয়েকগজের মধ্যে রয়েছে বাঙালী জীবন প্রক্রিয়ার নানা শিল্পকর্ম। সাদামাটা রিক্সা, অন্যান্য যান থেকে শুরু করে বিদেশী দূতাবাসের কর্মকর্তা ব্যবহৃত গাড়ী, সবকিছুতেই বাংলা নম্বর লেখা রয়েছে। একজন ছাত্রনেতার মন্তব্য হলো ভিন্ন দেশের মানুষ কিংবা বিদেশিদের বিষয়টি বুঝতে অসুবিধা হলেও দেশের আপামর জনসাধারণকে জাতীয়তাবাদী চেতনায় ঐক্যবদ্ধ করার জন্য এটির ব্যবহার ভিন্ন অন্য কোন উপায় নেই। এর প্রভাবও বেশ শক্তিধর। এই দিয়ে এটা বোঝানো হয় যে, বাঙালীরা এমন একটি জাতি যারা একমাত্র স্বাধীনতার জন্য নয়, মাতৃভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যও যুদ্ধ করেছে, বুকের রক্ত দিয়েছে। এছাড়াও অন্য কারণটি হলো পিছিয়ে পড়া বাঙালীকে শিক্ষিত করে এগিয়ে নেয়া। সার্থক হোক কিংবা না হোক রাষ্ট্রীয় ভাবেই এই উদ্যোগ চলছে দীর্ঘদিন।

বর্তমান বাংলাদেশে কট্টর একটা শক্তি ইসলামী নাম ধারণ করে ৭৫ সালে শেখ মুজিবের নেতৃত্বের আওয়ামী সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে। ক্ষমতারোহণের পর সেই শক্তি কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন করে। এর মধ্যে রয়েছে রেডিও টেলিভিশনে আযান অনুষ্ঠান প্রচার। কিন্তু এই পরিবর্তন মূল সামাজিক অবকাঠামোর কোন পরিবর্তন সূচিত করতে পারেনি। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ধর্মগ্রন্থ গুলো থেকে সামান্য উদ্ধৃতিও এখানে করা হয়েছে। এর মধ্যে হিন্দুদের গীতা, খ্রীষ্টানদের বাইবেল ও বৌদ্ধদের ত্রিপিটক অন্যতম। বাংলাদেশের শাসন কাঠামো একই সঙ্গে কোন ইসলামিক শাসনতন্ত্রের রাষ্ট্র যেমন নয় তেমনি ধর্মনিরপেক্ষও নয়। ফলে যে দল ক্ষমতা দখল করে তারা আবহমান বাংলা ও বাঙালী সংস্কৃতির কোন কিছুকে একচুল পরিমাণও পরিবর্তন করতে পারিনে। একজন ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক উত্তর করলেন বাংলাদেশকে স্বৈরাচারী সরকার ইসলামী প্রজাতন্ত্র বা রাষ্ট্র ঘোষণা করা সত্ত্বেও সামাজিক সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যই বাংলাদেশকে একটি অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। যা অন্যান্য দেশ কিংবা আপনাদের পাকিস্তানে নেই। বর্তমানে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের দূরত্ব ক্রমাগত কমছে। অবশ্য কিছু কিছু মৌলিক বিরোধের সামান্যতম অগ্রগতি আজ পর্যন্ত হয়নি। যেখানে পিআইএ আগত যাত্রীকে দিল্লীতে কঠোরভাবে চেক করা হয় ঢাকায় তত কঠোরতা নেই। এই অগ্রগতি সুখকর -বলতে দ্বিধা নেই। অবশ্য ২০ বছর পর যে কোন ঘটনা ঘটবেনা তা বলা মুশকিল। কোথায় যেন একটা সন্দেহ থেকে যায়।

দি হেরাল্ড, ডিসেম্বর '৯১
জাফর আব্বাস।

www.pathagar.com

ফেরার অপেক্ষায় যারা

পাকিস্তান ভেঙ্গে পূর্বাংশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ। কিন্তু ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে হাজারো পাকিস্তানের নাগরিক এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে অবস্থান করছে, যারা ৭১ এ পাকিস্তান ভাঙ্গন এর কারণে আজো নিজ বাসভূমে পরবাসী। তারা হলো বিহারী, যারা বাংলাদেশের নানা ক্যাম্পে থাকে। বাংলাদেশের আটকে পড়া বিহারীদের ফিরিয়ে আনতে পাকিস্তান সরকারের ৩টি চুক্তি বাস্তবায়ন করার জন্য জেনেভা ক্যাম্পের বিভিন্ন জায়গায় নানান দেয়াল লিখন, পোস্টার, ব্যানার বেশ লক্ষণীয়। আটকে পড়া পাকিস্তানীরা সেই চুক্তির অগ্রগতি কতটুকু কি হলো এ সম্পর্কে জানার জন্য আজ সংবাদপত্র পড়ে। নিজেদের ভাগ্য নিয়ে তারা আজ সর্বদাই উদগ্রীব। তারা অস্বাস্থ্যকর, মানবেতর ও বন্দী জীবনে বাস করতে চায়না। এই চিত্রটি ঢাকা শহরের মোহাম্মদপুর জেনেভা ক্যাম্পের। তারা ফিরে আসতে চায় তবে নিশ্চিত করে কেউ কথা দেয়নি। তারা একটি সংগঠন করেছে যা তাদের ফিরে আসার একটি ক্ষীণ আশা। পাকিস্তান চুক্তি ভঙ্গের ফলে বাংলাদেশে বর্তমানে ৬৫ টি জেনেভা ক্যাম্প প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নিজেদেরকে তারা মেহসুরীন-ই-বাংলাদেশ হিসেবে পরিচয় দিলেও বাঙালীরা তাদের বিহারী রূপেই চিহ্নিত করে। বিহারীরা ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ঢাকা পতনের পরও পাকিস্তান সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বাগত জানিয়ে তারা নিজেদেরকে পাকিস্তানের নাগরিক হিসেবে পরিচয় দেয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার আজ ২০ বছর পার হলেও তারা পাকিস্তানের নাগরিকত্বের দাবি নিয়ে পাকিস্তানে ফিরে আসতে চায়। তারা মনে করে, পাকিস্তান তাদের মাতৃভূমি। পাকিস্তানের নাগরিক হওয়ার জন্যই ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগকালে তারা বাংলাদেশে তথা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে গিয়েছিল।

পাকিস্তানের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী (ক্ষমতাচ্যুত) নেওয়াজ শরীফ আমাদের ব্যাপারে অত্যন্ত সহানুভূতিশীল এবং পাকিস্তানে আমাদের ফিরিয়ে নিতে তিনি বেশ আন্তরিক। আমরা এও আশাবাদী যে, তিনি আমাদের খুব শিগগীরই পাকিস্তানে ফিরিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করবেন - একথা বলেছেন স্ট্যান্ডার্ড পাকিস্তানী জেনারেল রিপার্টিশন কমিটি (এসপিজিআরসি)র সাধারন সম্পাদক শওকত আলী। তিনি কথা প্রসঙ্গে আরো জানালেন আমাদের প্রধান নেতা নাসিম খান দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আটকে পড়া পাকিস্তানীদের ৬৬টি ক্যাম্প ইতিমধ্যে পরিদর্শন করেছেন। এবং আমাদের সামগ্রিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেবেন বলে ও কথা দিয়েছেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী তাদের দাবিমতে এদের পাঞ্জাব প্রদেশে পুর্ণবাসনের আশ্বাসও দিয়েছেন। গত মাসে (নভেম্বর'৯১) আটকে পড়া পাকিস্তানীদের ফিরিয়ে আনার জন্য বেশ কটি বৈঠক হয়েছে।

www.pathagar.com

এবং সেখানে তাদের ফিরিয়ে আনার কার্যকর পদক্ষেপ কি হতে পারে তা সম্পর্কে বিস্তারিত পর্যালোচনা ও সুপারিশ গৃহীত হয়েছে। সংগঠনের নেতারা আরো জানিয়েছেন অতীতে এ ধরনের পদক্ষেপ গৃহীত হলেও সেই সিদ্ধান্ত বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেনি। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সবাইকে ফিরিয়ে আনার কথা থাকলেও ফিরিয়ে আনা হয়নি। তারা এখন পাকিস্তান সরকারের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের দাবিতে অপেক্ষমান।

বাংলাদেশে আটকে পড়া পাকিস্তানীরা ৬৬টি জেনেভা ক্যাম্পে অবস্থান করছে। এখানে প্রায় আড়াই লক্ষ বিহারী রয়েছে। নিজেরা স্থায়ীভাবে বাংলাদেশে বসবাস করবে এমন চিন্তাধারাও তাদের নেই । ফিরে আসার আন্দোলন করছে সর্বদাই। অপরদিকে পাকিস্তান বাংলাদেশ সম্পর্ক ক্রমশ উষ্ণতার দিকে এগুচ্ছে। রাষ্ট্রপ্রধানরা সফর করছেন। সরকারি কর্মকর্তারা আসছেন -যাচ্ছেন কিন্তু তাদের ফিরিয়ে আনার কার্যকর কোন পদক্ষেপ আজও গৃহীত হয়নি। এমনকি ৭১ সালের পাকিস্তানও তাদের এ অবস্থা কেন শাসক কর্মকর্তারা ভাবেন না, তা নিয়ে এই আটকে পড়া বিহারী বংশদ্ভুত পাকিস্তানীদের অভিযোগ। বিশেষত পাকিস্তান সরকারের কাছে। এরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় একদিকে যেমন স্বাধীনতার চেতনায় উজ্জীবিত বাঙালী দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছিল অন্যদিকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী কর্তৃকও যথেস্ট লাঞ্ছিত হয়েছেন। তারা সেদিন যে ভয়াবহ অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়ে দিনাতিপাত করেছে। আজ মনে হয় পাকিস্তান সরকার সে ব্যাপারে কোনরূপ মাথা ঘামায় না। তারা নিজেদের মনে করে পাকিস্তানের নাগরিক। বাংলাদেশকে সমর্থন না করে ৭১ এ পাকিস্তানকে সমর্থন তাদের জন্য যেন শাপেবর। এখনও তারা পাকিস্তানের সঙ্গে সংহতি ও ঐক্যের ঝান্ডা তুলে ধরে, যার ঐতিহাসিক কারণ হলো দ্বিজাতিতত্ত্বের পাকিস্তান সৃষ্টি হলে ভারতের বিহার ও অন্যান্য প্রদেশ থেকে ৪৭এর পর তারা পূর্ব বাংলায় আসতে শুরু করে। বিহারীরা ভারতে স্থায়ী হতে পারেনি। পূর্ব পাকিস্তানে এসে ২০ বছরের মধ্যে তাদের আবার প্রকৃত মাতৃভূমির সন্ধান করতে হবে, পশ্চিম পাকিস্তানে যেতে হবে একথা ভাবেনি। বাংলাদেশে বিহারীরা নিজেদের পরজীবী ভাবছে।

বাংলাদেশের অধিবাসীরা অপরদিকে বিহারী সমস্যাকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা হিসেবে চিহ্নিত করে। বাঙালীরা এও মনে করে বিহারীরা যেহেতু পাকিস্তানকে নিজেদের দেশ বলে মনে করে সেহেতু তাদের এক মুহূর্তও বাংলাদেশে থাকতে দেয়া উচিত নয়। "আমরা যেসব ক্যাম্পে গত ২০ বছর ধরে বাস করছি, এখানে আমাদের নতুন প্রজন্মরা এসেছে। কিন্তু আমরা তাদের আশার বাণী শুনাতে পারিনি, তেমনি তাদের ভবিষ্যত গড়ার সুস্পষ্ট কোন পথ নির্দেশনাও দিতে পারিনি" কথাগুলো বললেন আটকে পড়া এক পাকিস্তানের নাগরিক আবদুল কাইয়ুম। তারা পাকিস্তানের

www.pathagar.com

রাজনীতির প্রতি অত্যন্ত স্পর্শকাতর এবং তাদের ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ গৃহীত হচ্ছে কিনা তা নিয়ে সর্বদাই উদগ্রীব থাকেন একথাও জানালেন তিনি। সিন্ধু প্রদেশে জাতীয়তাবাদ আন্দোলন ক্রমাগত তীব্র থেকে তীব্রতর হওয়ার প্রেক্ষিতে নেওয়াজ শরীফ তাদের পাঞ্জাব প্রদেশে পুর্ণবাসনের কথা ঘোষণা করেছিলেন একথাও জানালেন তিনি। বর্তমানে বিহারী সমস্যার কারণ হিসেবে সিন্ধু অধিবাসীদের আন্দোলনকে আব্দুল কাইয়ুম দাবী করেছেন যে, সিন্ধীরা করাচী পর্যন্ত বন্ধ করে দেবে একথা ঘোষণা করেছেন, সেই সিন্ধীদের ভয়ে বিহারী সমস্যার কোন কার্যকর অগ্রগতি আজও হতে পারেনি। এতে বোঝা যায় এসপিজিআরসি নেতারা পাকিস্তানে তাদেরকে নিয়ে নানান তর্ক বিতর্কের খোঁজও রাখেন। অপরদিকে বিহারীদের পাঞ্জাবে পুর্ণবাসনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে কোন পাঞ্জাবী তাদের সম্পত্তি সরকারকে দেবেনা বলে ঘোষণা করেন। এসব অমানবিক(?) সিদ্ধান্ত বিহারীদের ফিরে আসাকে একেবারে অনিশ্চিত করে তোলে। এমনকি পাকিস্তান সরকার তাদেরকে ফিরিয়ে আনার পরিণতি কি হতে পারে তা নিয়েও বেশ উদ্বিগ্ন। ফলে সমস্যা সমাধানে অগ্রগতির ধারাও মন্থর। অপরদিকে মোহাম্মদপুর থানার ক্যাম্পের প্রধান জানে আলম জানালেন, "পাকিস্তান সরকার যেখানেই আমাদের নিরাপত্তা দিতে পারবেন আমরা সেখানে ফিরে যাবো।" কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, আমাদের ফিরিয়ে নেয়ার ব্যপারে পাকিস্তান সরকার কোন ইতিবাচক ও বাস্তবোচিত পদক্ষেপ নিতে পারেনি। পাকিস্তানের জনগণকে তিনি তীব্র ভাষায় সমালোচনা করে বলেছেন, যারা আজ বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্যাম্পে পাকিস্তান রাষ্ট্রকে সমর্থন করে মানবেতর দিনযাপন করছে তাদের ফিরিয়ে না নেয়া পাকিস্তান রাষ্ট্র সত্বার জন্য দুঃখজনক। তাদের ফিরিয়ে আনার জোরালো দাবিও তিনি এখানে করেন।

মোহাম্মদপুর ক্যাম্পে সর্বদা পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা উড়ে। নিজেদের তারা পাকিস্তানের নাগরিক হিসেবে পরিচয় দিচ্ছে। বাংলাদেশ সরকারের ঔদাসীন্যকে সমালোচনা করে বলেন, বাংলাদেশ সরকারের নীতির কারণে তারা এখানে চাকুরী পাচ্ছেনা। বাঙালীরা পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ও পাকিস্তানকে যেভাবে ১৯৭১ সালে ঘৃণা করতো বিহারীদের এখনো পাকিস্তানী অত্যাচারীদের দোসর হিসেবে গণ্য করে। যা বিহারীদের পীড়ার কারণ, একজন বয়োজেষ্ঠ বিহারী জানালেন একথা। বাঙালীরা তাদের দুরবস্থার কথা ভাবেনা। চিন্তা করেনা আমরা কেন পাকিস্তানে ফিরে যেতে পারিনি। বাঙালীদের কাছে আমরা হলাম মেরুদন্ডহীন জাতি। ঢাকার এক সাংবাদিক এক মুহূর্তও বিহারীদের বাংলাদেশে থাকা উচিৎ নয়, এ মন্তব্য করলেন। বাংলাদেশের মাটি স্বাধীনতা বিরোধীদের জন্য নয়। বিহারীরা পাকিস্তান চেয়েছিল। এই মাটিতে বিহারীদের স্থান নেই। এখন একথা বলা কঠিন হবে কখন বিহারীরা পাকিস্তানে ফিরে আসবে, কবে তারা

www.pathagar.com

পাকিস্তানী এই স্বীকৃতি লাভ করবে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যতোদিন ৬৬ টি ক্যাম্প থাকবে ততোদিন ৭১ এর ভয়াবহ ঘটনা বাঙালী-পাকিস্তানী সবার মনে থাকবে। ভোলা যাবেনা। তাই সঙ্গত সমাধানের পথ খোঁজা জরুরি।

ফ্রাইডে রিভিউ
জুন ১৯৯১

www.pathagar.com

অন্য একটি বাংলাদেশের সন্ধানে

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিরাজমান সকল বৈপরীত্য সত্ত্বেও উন্নয়নে জলবায়ু ও প্রাকৃতিক অবস্থার দারুণ প্রভাব রয়েছে। যদিও বাংলাদেশের রাজনৈতিক ধারার ইতিহাসে প্রায় সবসময় নানা ঘাত-প্রতিঘাত বিরাজ করছে কিন্তু এর প্রকৃত রাজনৈতিক পরিবেশকে কোন নির্দিষ্ট একটি ধারায় বিশ্লেষণ করা বোধ হয় দুঃসাধ্য। ঢাকার রাজনীতি বিশ্লেষণ করলেই পুরো দেশের রাজনৈতিক গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ সম্ভব। এতদসত্ত্বেও বাংলাদেশের অর্থনীতির মূলভিত্তি কৃষি ও আর্থ সামাজিক প্রেক্ষিতের তেমন কোন পরিবর্তন আজো সাধিত হয়নি। খাদ্য সমস্যা বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা। স্বাধীনতার পর থেকে আজও বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে এই আন্দোলনের সার্থক পরিণতি খুঁজছে। বাংলাদেশের বর্তমান খাদ্যমন্ত্রী শামসুল ইসলাম বলেছেন, গত ৯ মাসে বাংলাদেশের খাদ্যনীতিতে যে ইতিবাচক পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে তার ফলাফল ইতোমধ্যে দেখা যাচ্ছে। তিনি এও জানালেন, জিয়া সরকারের আমলেও আমরা এরকম কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিলাম। বর্তমানে বিএনপির সেই পলিসি গ্রহণ করে খাদ্য উৎপাদন ও খাদ্য চাহিদার ঘাটতি পূরণকরতে যাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে তিনি কিছু তথ্য উপস্থাপন করে বলেন, ১৯৮৮-৮৯ সালে খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৩২ লক্ষ টন আর ৯০-৯১ সালে তা কমে দাড়িয়েছে ১৭ লক্ষ টন। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যক্ত করেন, পরে এই পরিমাণ আরও কমবে। তার মতে বর্তমান সরকার অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদনে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন।

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) এর পরিচালক খন্দকার মাহবুব হোসেন বাংলাদেশের গ্রাম পর্যায়ে কৃষি ও সামাজিক চিত্রের একটি ব্যষ্টিক বা ক্ষুদ্র পরিচয় ও অবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, বাংলাদেশ বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ তথা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধন করেছে। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেন, দেশের ৩৮ ভাগ লোক তথা সক্ষম দম্পতি বর্তমানে জন্ম নিয়ন্ত্রণের নানান পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। এর কারণে ১৯৯১ সালে যেখানে দেশের লোক সংখ্যা ১১.৭০ কোটি হবার কথা ছিল সেখানে বর্তমানে লোক সংখ্যা হয়েছে মাত্র ১০.৮০ কোটি। এর কারণ হিসেবে তিনি ভারত ও পাকিস্তানে বাংলাদেশের লোক চলে যাওয়ার প্রসঙ্গও উল্লেখ করেন। তবে পরিবার পরিকল্পনার সার্থক প্রয়োগই এর মূল কারণ, এ ব্যাখ্যাও তিনি দিয়েছেন। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার প্রাক্কালে এই হার ছিল '৩' (তিন) আজ সেই হারের পরিমাণ দাড়িয়েছে ২.২ (দুই দশমিক দুই) শতাংশ। সরকারী হিসাব মতে ৬৯-৭০ সালে খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল আনুমানিক ১০ লক্ষ টন। আজ সেই পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৭ মিলিয়ন টনে।

www.pathagar.com

দেশের বাৎসরিক উৎপাদন প্রবৃদ্ধির হার ৩ শতাংশ। অন্যদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.৫ শতাংশ। ফলে খাদ্য উদ্বৃত্ত রাখা বাংলাদেশের জন্য দায় হয়ে পড়ে। জনসংখ্যার দ্রুত ও অতিরিক্ত বৃদ্ধি খাদ্য উৎপাদনের হারকে অতিক্রম করে যায়, যে কারণে খাদ্য ঘাটতির সৃষ্টি হয়। বিআইডিএস এর পরিচালকের মতে, খাদ্য সমস্যা সহ নানা সমস্যা এড়িয়ে কিছু করার ক্ষেত্রে বর্তমানে কিছু কিছু বেসরকারি সংস্থা এগিয়ে এসেছে এবং জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি সহ বিভিন্ন দিকে তারা নানাভাবে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধন করেছে। যার মধ্যে দারিদ্র্য দূরীকরণে যে সংগঠনটি সবচেয়ে বেশী সার্থকতা অর্জন করেছে তথা কৃতিত্বের দাবিদার তা হলো 'গ্রামীন ব্যাংক'। যার সদস্য রয়েছে লক্ষ লক্ষ পরিবার। যারা নিজেদের উন্নয়নকে অত্যন্ত সফল ও কার্যকর প্রচেষ্টায় এগিয়ে নিচ্ছে। গ্রামীন ব্যাংক এর প্রধান উদ্যোক্তা হলেন ডঃ ইউনুস। তিনি নিজে একজন সামাজিক বিজ্ঞানী ও অর্থনীতির অধ্যাপক। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা কালে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছের একটি গ্রামে পরীক্ষামূলক প্রকল্পের সার্থকতা তাঁকে সারাদেশে প্রকল্পটি ছড়িয়ে দেয়ার অনুপ্রেরণা যোগায় এবং সার্থকতাও লাভ করে।

গ্রামের দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে যাদের ভূমির পরিমান আধ বিঘার কম তাদেরকে নিয়ে গ্রামীন ব্যাংকের অগ্রগতি ও কার্যক্রম। একই এলাকায় বসবাসরত ৫ জনের ১টি গ্রুপকে নিয়েই তাদের কর্ম। তাদেরকে ঋণ দেয়া হয় বিশেষত গৃহ - পালিত পশুপাখি যেমন হাঁসমুরগী, গরু - ছাগল পালন ও ক্রয়ের জন্য। গ্রামীন ব্যাংক নামক এই প্রকল্প যখন ক্রমাগত সাফল্য লাভ করতে থাকে তখন বিদেশি সাহায্যকারী সংস্থাগুলো মূলধন হিসেবে এই ব্যাংককে নানা রকম সাহায্য দিতে থাকে। এমনকি সরকারও সমর্থন করতে থাকে। গ্রামীন ব্যাংকটির মালিকানার সঙ্গেও এই সদস্যরা যুক্ত। বাংলাদেশে কার্যরত বিদেশি এনজিও সহ সমন্বিত গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্পও এই গ্রামীন ব্যাংক নীতিকে সমর্থন জানায়। তারা দারিদ্র বিমোচন প্রক্রিয়ায় গ্রামীন ব্যাংকের কার্যক্রমকে অত্যন্ত সফল বলেও অভিহিত করেন। এ কারণেই বাংলাদেশের অনগ্রসর গ্রামগুলো ক্রমাগত তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। বিআইডিএস এর এক জরিপ মতে, ৬০ ও ৭০ দশকে বাংলাদেশের গ্রামগুলো যে রকম পিছিয়ে পড়েছিল সে তুলনায় বর্তমানে অনেক অগ্রসর; যদিও শহর ও গ্রামের পার্থক্য অনেক বেশী। অপরদিকে খন্দকার মাহবুব হোসেন বলেন, বাংলাদেশের সবচেয়ে অনগ্রসর শাখাটি খুব সম্ভবত শিল্পক্ষেত্র। কারণ হলো স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগ সরকারের জাতীয়করণের ভয় আজো শিল্পোউদ্যোক্তাদের মধ্যে বিরাজ করছে। ফলে বৃহৎ পুঁজিপতি এগিয়ে আসছেনা। ১৯৮২, ৮৫, ৯১ সালে শিল্পায়নের অবাধ নীতি ঘোষিত হবার পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রটি সহজতর হলেও শিল্পস্থাপনে সাহসের সঙ্গে কেউ এগুচ্ছেনা। বাংলাদেশের এক কালীন অন্যতম শিল্পক্ষেত্র পাট ও

www.pathagar.com

টেক্সটাইল মিলে এখন উৎপাদন ক্রমাগত কমছে। আবার, গার্মেন্টস শিল্প বাড়ছে। ভূমির স্বল্পতার কারণে কৃষকরা এখন আর কৃষির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হতে পারছেনা। পরিকল্পনাবিদরা বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য শিল্প কারখানা গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। সেদিক থেকে ব্যাখ্যা করলে দেখা যায়, বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে রয়েছে সহস্রাধিক বাধা। যে বাধা সহজে অতিক্রমণও সম্ভব নয়। গত কয়েক বছরের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক টানাপোড়নের প্রভাব বর্তমানে পড়লে বাংলাদেশ উন্নয়নের মুখ দেখবে, কিংবা উন্নয়নের গতি ক্রমশ দ্রুততর হবে এমন মনে হয় না।

সানডে
এপ্রিল ১৯৯১

www.pathagar.com

বঞ্চিত অধিকারের পথে

'৭১ এ বাংলাদেশ তথা বাঙালীর স্বাধীনতার স্বপ্ন ব্যাপক ধবংস নিয়ে এসেছিল। এই যুদ্ধে সাধারণ মানুষ কেবল মৃত্যুর শিকারই হয়নি, দেশত্যাগেও বাধ্য হয়েছিল; সে এক করুণ অধ্যায়। বাঙালী জাতীয়তাবাদের অগ্রগতির পথে ভিন্ন প্রেক্ষিত। ১৬ই এপ্রিল বাঙালীর ইতিহাসে আর একটি স্মরণীয় দিন। মাত্র দু'দিন আগে ১৪ই এপ্রিল চট্টগ্রাম বন্দর ছেড়ে গিয়েছিল একটি যাত্রীবাহী জাহাজ। যদি না যেত তবে জাতিগত দাঙ্গায় বাংলাদেশের ভিন্ন একটি প্রেক্ষিত রচিত হতো। বিশেষতঃ ভয়াবহ রূপ পেত চট্টগ্রামে। ইমরান মাহমুদ নামক এক যাত্রী ১৭ই এপ্রিলের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা বর্ননা করেছেন। পরে আমরা পাকিস্তানের একটি ছবি দেখেছিলাম তার নাম 'পাকদামান'। চট্টগ্রাম থেকে সেদিন ১৩০০ যাত্রী নিয়ে শাসম্‌স জাহাজটি যাত্রার কথা থাকলেও প্রায় ৫০০০ লোক ঐ জাহাজে চড়েছিল এর মধ্যে ইমরান ও তার পরিবারের ৯ সদস্য ছিল। জাহাজটি এমনিতেই অতিরিক্ত যাত্রী বোঝাই ছিল। বাথরুম, গোসল খানায় লোক ঠাসাঠাসি করছে তখনো। ইমরান তখন পরিবার নিয়ে থাকতেন চট্টগ্রামের ফিরোজশাহ কলোনীতে। বেঙ্গল রেজিমেন্ট তখন ঐ এলাকা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলেন। তখনই তিনি সপরিবারে পাকিস্তানে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পরে অবশ্য পাঞ্জাবী রেজিমেন্টের আক্রমণে বাঙালীরা দখল ছেড়ে দেয়, ইমরান পরিবার তখন জাহাজের সন্ধানে কর্নফুলী নদীর পাড়ে। সেখানে তিনি দেখতে পেয়েছেন হাজার হাজার গুলিবিদ্ধ লাশ নদীতে ভাসছে। '৭১ এর সেপ্টেম্বরে জিন্নাহর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও শিল্পপতি মীর্জা আবু আহসান ইস্পাহানীর পুত্র মীর্জা মোঃ ইস্পাহানী পশ্চিম পাকিস্তানের এক বৈঠকে যোগ দিতে এসেছিলেন। পাকিস্তানে অবস্থানকালেই জানতে পারেন তিনি পূর্ব পাকিস্তানে আর ফিরে যেতে পারবেন না। অথচ পূর্ব পাকিস্তানের নামকরা ও সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পপতি হিসেবে তার যথেষ্ট আধিপত্য ছিল। চা,পাট, শিপিং থেকে শুরু করে ব্যাংক, ইন্স্যুরেন্স প্রভৃতি ব্যবসায় পুর্ব পাকিস্তানে ছিল তাদের একক আধিপত্য। অবিভক্ত ভারতে পাকিস্তান আন্দোলনের সময় তিনি ইস্পাহনীর বাড়িতে কাটিয়ে ছিলেন। পরে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে পূর্বাংশের শিল্পোন্নয়নের জন্য জিন্নাহর একান্ত অনুরোধেই ইস্পাহানি পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসেন। অপরদিকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর বেশির ভাগ ভারতীয় মুসলমান ব্যবসায়ী পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যান। কিন্তু একমাত্র জিন্নাহর সঙ্গে ওয়াদাবদ্ধ হওয়ায় তাকে পূর্ব-পাকিস্তানে আসতে হয়। তিনিও বিনা আপত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসেন। অবশ্য তিনি চিন্তা করেছিলেন, বৃটিশ-ভারতে কলকাতা ছিল শিল্প নগরী, পূর্ব-বাংলায় লোক সংখ্যা বেশি হলেও শিল্প প্রতিষ্ঠান ছিলনা। লাভের কথা চিন্তা করে তিনি পূর্ব-পাকিস্তানে চলে আসেন।

www.pathagar.com

বাঙালী সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে মোহাম্মদ ইস্পাহানী বলেছেন, পেছনের দিকে তাকালে দেখা যায় বাঙালীরা রাজনৈতিক চিন্তাধারায় ছিলেন অনেক পেছনে। অথচ এই বাঙালী '৭০ এর নির্বাচনে বিজয়ের পর স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু সেসময় পাকিস্তানের শাসক বিশেষতঃ সামরিক কর্মকর্তারা প্রতিক্রিয়ামূলক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ফলে বাঙালীরা আরও কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পাকিস্তানী ও বাঙালীদের মধ্যে বিরাজমান সম্পর্ককে তিনি দা-কুমড়া অথবা তেল-পানির সম্পর্ক বলে উল্লেখ করেন। ফজলে- এ-দোসানী নামক তৎকালীন পাকিস্তানের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বলেছিলেন, "বাংলাদেশ স্বাধীন না হয়ে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী যদি পূর্ব-পাকিস্তান দখল করে রাখতেন তবে আমরা হতাম পূর্ব-পাকিস্তানের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। অবশ্য স্বাধীন বাংলাদেশেও আমাদের অবস্থা তাই হতো। বাঙালীরা যখন আমাদের জীবন নাশের হুমকী দিচ্ছে তখনই আমার পুত্র আনিস পাকিস্তানে চলে আসে। তারপরের সপ্তাহে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ বেঁধে গেল।" দোসানির একটি বড় লজেন্স ফ্যাক্টরী সঙ্গে দুটো সিনেমাহল এবং বহুতলা বিশিষ্ট একটি বাণিজ্যিক ভবন ছিল ঢাকায়। যেগুলো এখন মুক্তিযোদ্ধা কল্যান ট্রাষ্ট এর মালিকানাধীন। দোসানী ভারত বিভাগের পর কলকাতায় ছিলেন এবং ১৯৫২ সালে মালিক ফিরোজ খান নুনের অনুরোধে পূর্ব- পাকিস্তানে ব্যবসা করার জন্য মনস্থির করলেন। পূর্ব পাকিস্তানে ব্যবসার মধ্যে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন সিনেমা হল। যেখান থেকে 'তালাশ' 'ছন্দ' প্রভৃতি ছবি বেশ নাম কুড়িয়েছিল। শবনমের তারকাখ্যাতির পেছনে এই প্রতিষ্ঠানের অবদান ছিল যথেষ্ট। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের এই ভাঙ্গন '৪৭ সালে পাকিস্তানকে নিয়ে যারা স্বপ্নের সৌধ রচনা করেছিল তারা '৭১ এর ঘটনায় হতবিহব্বল হয়ে গিয়েছিলো। পাকিস্তানের এই বিভাজনে সাধারণ জনগণ কেবল মৃত্যুর শিকারই হয়নি তারা দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলো। অর্থ সম্পদ হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়েছিলো। পাকিস্তান সামরিক বাহিনী ও পাকিস্তান সরকারের মতো অবাঙালী-বিহারীসহ সকল পাকিস্তানীর প্রতি বাঙালী মুক্তিযোদ্ধারা একই মনোভাব পোষণ করে। আক্রমণ করতে থাকে সবাইকে । বাংলাদেশে পাকিস্তানি সৈন্যরা বাঙালী মুক্তিযোদ্ধাদের সাড়াঁশি আক্রমণ করে। পাকিস্তানী সৈন্যদের ধারণা বাঙালীরা দেশপ্রেমিক নয়, তারা হিন্দুদের সমর্থক, ভারতের দালাল। বাঙালী মুক্তিযোদ্ধা এবং পাকিস্তানী সৈন্য উভয়ের কাছে হত্যার ব্যাপারটি ছিল হিংসাত্মক।

ইয়াহিয়া খান পশ্চিম-পাকিস্তানী আর্মিদের বাঙালী নিধনের নির্দেশ যখন দেন তখন তা অত্যন্ত হীনমন্যতার সঙ্গেই দিয়েছেন । যার মধ্যে বর্বরতার চিহ্ন রয়েছে বলেও তিনি জানালেন। আবার পাকিস্তানী আর্মিরা বাঙালীদের হত্যার প্রক্রিয়া সহজতর ও নিজেদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্যে কিছু বাঙালীদের নিযুক্ত করেছিলেন। যারা মূলতঃ ছিলেন

www.pathagar.com

পাকিস্তানের সমর্থক। তৎকালীন জামায়াতে ইসলামী দলের লোকেরাই পাকিস্তান রক্ষা করার জন্য জেহাদ করে এবং এরাই মূলতঃ আলবদর, আলশামস্ বাহিনী। এরাই বাংলাদেশের বরেণ্য বুদ্ধিজীবীদের নির্মমভাবে হত্যা করে। এই বর্বর ও ভয়ঙ্কর হত্যার জন্যে বিশ্বে ধিক্কার ওঠে। সমালোচিত হয় তাদের এই ঘৃণ্য অপকর্ম। স্বাধীনতা লাভের পর মুক্তিবাহিনী (ফ্রিডম ফাইটরস) রা এসব রাজাকার দালালদের আবার হত্যা শুরু করে। নিউজউইক ম্যাগাজিনে তখন একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয় যে, স্বাধীনতার পর মুক্তিবাহিনীরা রাজাকারদের হত্যার জন্য খুঁজতে থাকে, যতোক্ষণ পর্যন্ত ফটোগ্রাফার না আসে ততক্ষণ রাজাকারদের হত্যা করেনি। তারা রাজাকারের বীভৎস হত্যার ভীতি প্রচারের জন্যে এটি করেছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। বাংলাদেশের সেই হত্যাকান্ড ও ট্রাজেডির জন্য পাকিস্তানীরা ছিল সবসময় ভীত। এই হত্যাযজ্ঞ থেকে পাকিস্তানে বিশ্বস্তরাও বাদ যায়নি। তারাও এই হত্যাযজ্ঞের শিকার হয়েছেন। পাকিস্তানের পতনের পর যাদেরকে পিপলস পার্টি নিজেদের সমর্থক হিসেবে মনে করেছে, কলোনী বরাদ্দ করেছে, তাদেরকে বাংলাদেশ ত্যাগে বাধ্য করেছে। তাদের শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরীর কোন সুযোগ আর দেয়া হয়নি। পাকিস্তান সরকারও চলে গেছে। আদমজী, বাওয়ানী, দাউদস সব শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে প্রায়। উৎপাদনও খুব কম হয়েছে। সেই মুহূর্তে বাংলাদেশে সুস্থভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করার কোন অনুকূল পরিবেশ ছিলনা বলে দোসানিস মন্তব্য করেন। ক্রমান্বয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতাত্তোর সরকার একের পর এক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো জাতীয়করণ করার ফলে পাকিস্তানী ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়; এই মন্তব্যও সেই ব্যবসায়ী দোসানিসের। যখন থেকে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক পুনঃসংস্থাপিত হতে থাকে তখনও ভারতের সাথে যুদ্ধকালীন বাংলাদেশের সম্পর্ক, ধর্ম, সামরিক শাসন, নির্যাতন ইত্যাদির নানান চিত্র জাতীয় যাদুঘর ঢাকায় সংরক্ষিত আছে যা ১৯৭১ সালকে স্মরণীয় করার জন্যই যাদুঘরে রাখা হয়েছে। তাদের ইচ্ছে আগামী প্রজন্ম তা জানুক।

যাদুঘরের একটি বড়ধরনের কামরা মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের আন্দোলনের ইতিহাস সহ বিভিন্ন চিত্রের জন্য রাখা হয়েছে। এখানে রয়েছে একটি টেবিল, যে টেবিলে জেনারেল অরোরার কাছে নিয়াজি আত্মসমর্পণ করেছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা চুক্তি যে টেবিলের উপর স্বাক্ষরিত হয় সেই টেবিলটিসহ যুদ্ধকালীন মুক্তিযোদ্ধা কর্তৃক ব্যবহৃত অস্ত্র, পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর নানা নির্যাতনের চিহ্ন রাখা হয়েছে এ কক্ষে। যুদ্ধকালীন মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে বন্দি পাকিস্তানী সামরিক অফিসারদের পরিচয় পত্র, বিভিন্ন মেডেল, ভারতীয় হাই কমিশনে প্রথম উত্তোলিত বাংলাদেশের পতাকা, সে সময়ে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, ষ্ট্যাম্প ইত্যাদি। দেয়ালচিত্রগুলোর মধ্যে বাংলাদেশকে সাহায্য করার জন্য পোস্টারসহ বিখ্যাত বাঙালী শিল্পী কামরুল হাসান কর্তৃক অঙ্কিত ইয়াহিয়া খানের বীভৎস

www.pathagar.com

একটি চিত্র এখানে স্থান পেয়েছে। কামরার একেবারে শেষপ্রান্তে রয়েছে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর নানা হত্যাযজ্ঞ ও শহীদদের মাথার খুলি, হাঁড় ইত্যাদি সহ বিভিন্ন নির্যাতনের চিহ্ন।

ঢাকার অদূরে সাভারে নির্মিত জাতীয় স্মৃতি সৌধটি লাল ইটের তৈরি। সুউচ্চ সেই সৌধটিকে দেখলে মনে হয় একসাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত। যেন রক্ত থেকে উঠে আসা স্বাধীনতা, সারা এলাকায় সবুজ ঘাস, গাছ, জাতীয় ফুল শাপলায় ভরা লেক, মনে হয় বাংলাদেশ; যা সবুজে ঘেরা, তার মধ্যে যেখানে মুক্তিযোদ্ধা দেশপ্রেমিকদের লাল রক্ত, সেখানটায় সৌধ। প্রমাণ আছে এই সৌধস্থলে পাকিস্তান আর্মিরা বহু বাঙালীকে হত্যা করেছে। সেই স্মৃতিকে স্মরণীয় করার জন্যই এই জায়গাকে বেছে নেয়া হয়েছে। পাকিস্তান সরকার প্রধান জিয়াউল হক যখন বাংলাদেশ সফরে যান তখন ঐ স্মৃতিসৌধে তিনি পুষ্পস্তবক অর্পণ করেছিলেন। বাংলাদেশের রীতি অনুযায়ী বিদেশি অতিথিরা বাংলাদেশ ভ্রমণ কিংবা সফরে গেলে তাঁকে জাতীয় স্মৃতি সৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করতে হয়। জানিনা জিয়াউল হক প্রথাবদ্ধ সেই কাজটি করার জন্য সাভারের স্মৃতিসৌধে যখন যান তখন তার মনে কি অনুভূতি হয়েছিল। অতীতের ফেলে আসা দিনগুলোর কথা মনে হয়েছিল কিনা।

দি ডন ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৯১
জোহরা ইউসুফ

www.pathagar.com

পাকিস্তান চলো : এখনো ভিন্নসুর

করাচীর কোন সম্ভ্রান্ত আবাসিক এলাকায় আজ খোঁজ নিলে দেখা যাবে প্রচুর বাঙালী যুবক চাকর অথবা ভৃত্যের কাজ করছে। এই বাঙালীরা তাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ থেকে অত্যন্ত সংকটময়তার মধ্য দিয়ে ভারত ও পাকিস্তান সীমান্ত পার হয়ে এসেছে। এই সীমান্ত অতিক্রম করা কতটুকু দুঃসাধ্য ও কষ্টের তা আর বর্ণনার অপেক্ষা রাখেনা। তবুও অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার জন্য তারা পাড়ি জমায় পাকিস্তানে। ৭০-৮০ এর দশকে মধ্যপ্রাচ্যে পাকিস্তানীরা চলে যেতে থাকলে কাজের লোকের যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছিল বাঙালীদের অবাধ আগমন সেই শূন্যস্থানগুলো পূরণ করেছে। এসব বাঙালীর সংখ্যা এতোই বেড়েছে সরকার এদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেবে তাও সম্ভব হচ্ছে না। এই বাঙালীরা আবার অদক্ষ বলে মিল কারখানায় কাজ না করে রান্নার কাজ, গৃহভৃত্যের কাজ অফিস পিওন এসব কাজই করছে। পরে তারা একসময় পাকিস্তানের নাগরিকত্ব দাবি করে এবং নাগরিকত্ব পেয়েও যায়।

৪০ বছর বয়সের রমজান এক দেশরক্ষা বিভাগের কর্মকর্তার বাসায় কাজ করছেন। যুবক থাকা কালে তিনি ছিলেন সক্রিয় আওয়ামী লীগার। নিজেকে বাঙালী এবং আওয়ামী লীগার হিসেবেই পরিচয় দিতে তিনি গর্ববোধ করেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে তিনি প্রায় সময় আওয়ামী লীগের সভা সমিতিতে যেতেন, শেখ মুজিবের বক্তৃতা শুনতেন। সেই বক্তৃতা তার যুবক মনকে আন্দোলিত করতো, পাকিস্তানী স্বৈর শাসকদের বিরুদ্ধে তার চেতনাকে আরো শাণিত করতো। বাঙালী হিসেবে একজন একনিষ্ঠ আওয়ামী লীগ কর্মী হিসেবে তিনি গর্ব করতেন। তিনি বললেন, যদিও আজ আমরা স্বাধীন তবুও আমার পরিবার ক্রমশ দরিদ্রতার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। স্বাধীন দেশে আমরা হতে থাকি বঞ্চিত। পাকিস্তানী কায়দায় আবার আমাদের উপর সামরিক শাসন চেপে বসে। আর তখনি বাংলাদেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হই। এখানে আমার কোন পাসপোর্ট নেই তাই মাঝে মাঝে পুলিশ আমাদের নাজেহাল করে। আমি যশোর সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে আসি, সহযোগিতা করে একজন লোক। আমরা ৩ জন এভাবে এসেছি একের পর এক। অন্য দু'জন আমার চাচাত ভাই যাদের নাম রমজু ও বাবু। এরা এখানেই এক চাইনিজ রেষ্টুরেন্টে ওয়েটার হিসেবে কাজ করছে। যদিও তাদের সঙ্গে কোন মহিলা ছিলনা তবুও যারা তাদেরকে পার করেছে এক মহিলার মাধ্যমেই রমজানদের সঙ্গে সেই লোকদের পরিচয় ঘটে। সেই সীমান্ত পার হওয়ার ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে রমজান এখনো ভয় পায়। তিনি বলেছেন, পার হওয়ার সময় সারাক্ষণ ভয় থাকতো, এবার বুঝি ধরা পড়লাম। এখন অবশ্য তত ভয় নেই, কেননা অহরহ বাঙালীরা এপার-ওপার হচ্ছে। একবার

www.pathagar.com

পুলিশের হাতে ধরা পড়েছেন তবে অসুবিধা হয়নি। ঐ এজেন্ট পুলিশের হাত থেকে বাঁচিয়ে এনেছে।

মালেক এখন পাকিস্তানের পিইসিএইচএস নামক একটি প্রতিষ্ঠানের মালিকের বাড়িতে কাজ করেন। কোম্পানির বাচ্চা কাচ্চার দেখাশুনা করা স্কুলে আনা নেয়া, খেলাধুলা করাই তার কাজ। শুক্রবার ছুটি। এই দিনটি হিন্দি ফিল্ম দেখে নইলে অন্যান্য বাঙালীদের সঙ্গে গল্প গুজব করে কাটান। রমজু, মালেক দুজনেই আয়ের বেশিরভাগ টাকা দেশের বাড়িতে পাঠান। নিজস্ব এজেন্ট এর মাধ্যমে এবং সামান্য একটি কমিশনের বিনিময়ে এ টাকা পাঠানো হয়। ঢাকার অদূরে মানিকগঞ্জের ছেলে মালেক পাকিস্তানে আসার পর থেকে আজ অবধি বাংলাদেশে যাননি। কিন্তু রমজু '৮৩ সালে আসলেও দুইবার দেশে গেছেন। সে জানালো সেখানে আত্মীয়-স্বজনের বেকার যুবকদের পাকিস্তানে আনার বহু অনুরোধ সে উপেক্ষা করেছে। যারা সাধারণ বাঙালীদের সীমান্তে পারাপারে সহায়তা করে তারা বাঙালীদের কাছে দালাল নামে সমাধিক পরিচিত।

দি হেরাল্ড, ডিসেম্বর ১৯৯১
জাফর আব্বাস

www.pathagar.com

বাংলাদেশ : এক দুঃস্বপ্ন

সোনার বাংলা অবহেলিত কেন? সোনার বাংলায় দুঃখ কেন? ৬০ এর দশকের শেষ দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়ালে এ ধরনের প্রচুর শ্লোগান দেখা যেতো। শ্লোগানের মূল অর্থ ছিলো এক সময়ের শস্য সমৃদ্ধ পূর্ববাংলা সে সময়ের পূর্ব পকিস্তানে পাঞ্জাবীদের শোষণ আর অত্যাচারে 'সোনার বাংলা' তার ঐতিহ্য আর রাখতে পারলোনা; পাঞ্জাবীরা তা কেড়ে নিয়েছে। ১৯৭০ এর নির্বাচনের কয়েকদিন আগ থেকে এ ধরনের বহু শ্লোগান তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের আকাশ-বাতাসকে প্রকম্পিত করেছে। নির্বাচনের মাত্র কয়েক দিন আগের ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস পূর্ব-পাকিস্তানের উপকূলবর্তী এলাকায় আঘাত হানে এবং এতে ৫ লাখ লোকের প্রাণ সংহার ঘরবাড়ি ও ফসল সহ কোটি কোটি রূপি মূল্যের সম্পদ বিনষ্ট হয়। পুনর্বাসনে ইয়াহিয়ার নিস্প্রভ এবং ধীরে নেয়া পদক্ষেপ পূর্ব-পকিস্তানের সাধারণ জনগণকে বিদ্রোহী করে তোলে। পূর্বের নেতা মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী তখন বলেছিলেন, না ইয়াহিয়া, না তার মন্ত্রী এ অভাগা দুর্গতদের দেখতে এসেছে । এছাড়াও পাকিস্তানের এলিট, সামরিক শাসক পূর্ব-পাকিস্তানের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে সহ অনেক নেতাকর্মীকে বেআইনিভাবে জেলে রেখেছে, সাধারণ লোককে দরিদ্রতার কবল থেকে মুক্তি দিতে পারেনি। ১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বরের নির্বাচনে বিপ্লবী নেতা শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের ২টি আসন ছাড়া ১৬৯টি আসন জয় লাভ করে নেয়। এর একবছর পরেই একটি গৃহযুদ্ধের মধ্য দিয়ে পূর্ব-পাকিস্তান স্বাধীন বাংলাদেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই হলো পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

গত ২৯শে এপ্রিল প্রলয়ঙ্করী এক ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার ১ লাখ ৩৮ হাজার লোক মারা যায়, ঘরবাড়ি ও সম্পদ বিনষ্ট হয় ১২শ কোটি টাকার। পাকিস্তান একটি ভিন্ন দেশ হওয়ার সত্ত্বেও দুর্গত বাংলাদেশীদের জন্য অনেক বেশি সমবেদনা জানিয়েছে, দরদ দেখিয়েছে, কিন্তু নেওয়াজ শরীফ বাংলাদেশের দুরবস্থা দেখার জন্য একবারও যাননি।

বাংলাদেশ বিশ্বে এখনো একটি দরিদ্র দেশ হিসেবে চিহ্নিত, অভাব যার নিত্য সঙ্গী। ১৮০ ডলার মাথাপিছু আয়, বিশ্বের দরিদ্রদের মধ্যে তাদের স্থান, ৭৬ ভাগ বাংলাদেশের লোকজন এখনো কৃষির ওপর নির্ভরশীল এবং প্রায় ৬০ ভাগ লোক ভূমিহীন। প্রতি বছর এই ভূমিহীনদের সংখ্যা শতকরা ৪ থেকে ৫ ভাগ করে বাড়ছে। এছাড়া বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি এক মহা সমস্যা, ৫৫,০০০ বর্গমাইলের একটি দেশ গুটি কয়েক শিল্প প্রতিষ্ঠান ও সামান্য প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার করে ১২ কোটি লোকের অন্ন সংস্থান

www.pathagar.com

করছে। এখানে মাটি ও পানি ছাড়া অন্য কোন সম্পদ নেই। এই লোকজন পর্যাপ্ত অন্নের যোগাড় করতে অপেক্ষাকৃত উর্বর সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় ঘনবসতি গড়ে তোলে। বেশির ভাগ বাঙালীরা এখন কোন মতে মাথা গুঁজে খেয়ে না খেয়ে বেঁচে আছে।

বাংলাদেশে কর্মসংস্থান এক জটিলতর এবং ভয়াবহ সমস্যা। বর্গমাইলে ২ হাজার ৩৬ জনের ঘনবসতি। মাল্টা, সিঙ্গাপুর, হংকং বাদ দিয়ে পৃথিবীতে এটিই সম্ভবত সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। এদেশের মানুষ কর্ম সংস্থানের একটি সুযোগের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। সংখ্যাগরিষ্ট বাঙালীরা যে যেভাবে পারছে বৈধ বা অবৈধ পথে ভারত, পাকিস্তান ও মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশে ছুটে যাচ্ছে। যাদের কোন কাজের অভিজ্ঞতা নেই বা দেশ ভ্রমনের কোন বৈধ কাগজপত্র নেই তারা বিদেশের মাটিতে মানবেতর দিনাতিপাত করছে। করাচীতে গৃহভৃত্য হিসেবে বহু বাংলাদেশীকে এখন পাওয়া যাবে। তাদের ভাগ্য যে অবৈধদের চেয়ে খুব ভালো তা বলা মুশকিল, তবে কর্মসংস্থান আছে। অকল্পনীয় দরিদ্রতা তাদের কেবল শারীরিক কষ্টের কারণ নয়, মনোবেদনা এবং দু:খের কারণও। নৈতিক অবক্ষয় অধঃপতনের কারণ। দুর্নীতি এক সময় ছিল কল্পনাতীত এখন বাংলাদেশে তা নীতিতে পরিণত হয়ে গেছে। নিজ দেশে চাকুরী, ব্যবসার লাইসেন্স, টেলিফোন, বিদ্যুৎ লাইন - সব কিছুতেই ঘুষ ছাড়া উপায় নাই। সরকারি কর্মকর্তা হলেতো কথাই নেই, দুর্নীতি তার সঙ্গে লেগেই থাকে। গত বছর আগষ্ট মাসে (০১-০৮-৮৯) করাচী থেকে ঢাকা, তারপর নিজ শহর সিলেটে যাওয়ার জন্য একটি অভ্যন্তরীন রুটের টিকেট করি। টিকেট নিয়ে যখন ঢাকা এয়ার পোর্টে যাই তখন বলা হয়, যাত্রীপূর্ণ, অতএব আমি ট্রেন, বা বাস ধরার জন্য বাইরে টেক্সি নিতে যাচ্ছি। এমন সময় এক কর্মচারী এসে জানালো ভি.আই.পি. ও বিদেশিদের জন্য টিকেট আছে , তবে ডলারে মূল্য পরিশোধ করলে এ টিকেট পাওয়া যাবে। জাপানি শাড়ি পরিহিতা এক মহিলা কর্মকর্তাকে বিয়াল্লিশ ডলার পরিশোধের উদ্দেশ্যে আমি ভদ্রলোককে ষাট ডলার দিই এবং আধ ঘন্টা পর তিনি টিকেট নিয়ে আসেন। কিন্তু বাকি আঠার ডলারের কথা বললে তিনি মহিলাকে খুঁজছেন, একথা বলে উধাও হয়ে যান। তাহলে কি আমি সেই মহিলা বা কর্মচারীকে হারিয়ে ফেললাম ? যখন ফ্লাইট ছেড়ে যাবে, যাত্রীরা উঠে বসছে, তখন ঐ ভদ্রমহিলা বললেন, "আপনাকে ডলারে নয়, টাকায় ভাড়া পরিশোধ করতে হবে"। এ ধরনের বিড়ম্বনা এখন বাংলাদেশে ভুরি ভুরি।

উপমহাদেশের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা ও উপজাতীয় কোন্দল মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। বাংলার পূর্বাংশ যা এখন বাংলাদেশ নামে পরিচিত সেখানে নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের যথেষ্ট আধিপত্য বিরাজমান। তারপর খ্রীষ্টান, পরে সুফীবাদের প্রভাবে

www.pathagar.com

কিছু ধর্মান্তরিত মুসলমান এখন প্রধান সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছে। হিন্দুদের একক আধিপত্যকে খর্ব করার লক্ষ্য নিয়ে মুসলমানেরা সুফিবাদ প্রচারকারী আরব মুসলমানদের আকৃষ্ট করেছে। বৃটিশ ভারতের কালে বাংলায় মুসলমানরা প্রধান জাতি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে এবং সনাতন হিন্দুরা এই মুসলমানদেরকে পছন্দ করে না। কারণ ইতিহাস বলে, স্বাধীন দেশ হওয়া সত্ত্বেও দেশীয় মুসলমানদের কারণে পারস্যের মুসলমানেরা এদেশকে শাসন করেছে, ডাকাতি ও লুটতরাজ করেছে, এজন্য বাঙালী মুসলমানদের তারা সবসময় হিংসে করেছে। ১৯০৫ সালে প্রশাসনিক সুবিধার লক্ষ্যে ইন্ডিয়ার ভাইসরয় লর্ড কার্জন বাংলাকে দুটি ভাগে ভাগ করেন, নতুন প্রদেশ পূর্ব বাংলা যা এখন বাংলাদেশ এবং তৎসংলগ্ন আসামকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল। সৌভাগ্যবশত নতুন সৃষ্ট পূর্ব বাংলা মুসলিম প্রধান হয়ে গেলে এখানকার লোকজন শিক্ষা, চাকুরী এবং ব্যবসায় নতুন সুযোগ পেয়ে যায়, যা তারা আগে পায়নি। এসময় হিন্দুরা সন্ত্রাসী আন্দোলন শুরু করে। বঙ্গমাতাকে বিভক্ত করা চলবে না - এ দাবীতে তারা সন্ত্রাস শুরু করে; অবশ্য এ সন্ত্রাস সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। বৃটিশরাজ শাসনতান্ত্রিকভাবে এ সমস্যার সমাধান করে ফেলে। এরপর ১৯৩৭ ও ১৯৪৬ সালে দুটো নির্বাচনে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ট হয়ে পড়ে এবং দুইজন বাঙালী মুসলমান প্রধানমন্ত্রী হন। বাঙালী হিন্দু সম্প্রদায় কখনো তা পছন্দ করেনি, তারা পার্বত্য অঞ্চলকে সংখ্যাগরিষ্ট হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত করতে চাইলো।

ইতিহাস সেভাবে গড়ায়নি, হিসেবে ভুল হয়ে গেছে। ১৯৪৭ সালের বসন্তে সৃষ্ট পাকিস্তান সবাইকে অবাক করে দিয়েছে। মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ট বাংলা, আসাম এবং পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল নিয়ে পাকিস্তান গঠিত হবে - এ ধরনের আভাস আগে পাওয়া যায়। পূর্ব বাংলায় বসবাসকারী হিন্দুরা এ সময় প্রমাদ গুণতে থাকে। তারা দাবি তোলে, এসব অঞ্চলের সব এলাকা মুসলমান প্রধান নয়, প্রধান শহর কলিকাতায়ও হিন্দুদের প্রাধান্য রয়েছে, এ সময় বৃটিশ শাসক কোন আভাস ছাড়া বাংলাকে বিভক্ত করে। পশ্চিম অংশের সঙ্গে যুক্ত করে পাকিস্তান সৃষ্টি করা হয় এবং হিন্দুদের চাপে পড়েই তা করতে হয়েছে। এসব পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তান বন্যা ও খরা কবলিত পূর্ব বাংলা বা পূব-পাকিস্তানকে গড়ে তোলে। দূর্ভাগ্যবশত যার তিন দিকেই ভারত। এসময় পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানগণ পশ্চিমের মত অতটা গুরুত্ব পেলনা। ৫০ শতাংশ পশ্চিম-পাকিস্তানীর বিরোধিতা সত্ত্বেও রাজনৈতিক ও সামরিক নীতি নির্ধারকরা পূব-পাকিস্তানকে এতটা গুরুত্ব দিতে রাজি নয়-এ কারণে পূর্ব-পাকিস্তান শুরু থেকে পশ্চিমা শাসকদের ঘৃণার চোখে দেখতে শুরু করে।

www.pathagar.com

বর্তমান বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ট দেশ । দেশের যে কোন স্থানে অবাধে ইসলামী নীতি, রীতি ও সংস্কৃতির চর্চা করা যায় । কিন্তু বহু বছর ধরে সে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির কোন লক্ষণ নেই। ভারতকে তারা সবসময় গালিগালাজ করে এবং ভারতের আচরণে তারা অখুশী, ভারত তাদেরকে কলিকাতা দেয়নি এ অভিযোগে তারা ভারতকে ঘৃণা করে। ১৯৪৭ সালে ভারতের সঙ্গে যোগ না দিয়ে পাকিস্তানে যোগ দেয়া কি ভুল ছিল ? ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে বেশিরভাগ বাঙালী মুসলিমদের কাছে এই প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল । এদের মাত্র কয়েকজন ভারতের সঙ্গে পুনরায় যোগ দেয়াকে ভুল মনে করেন। কিন্তু সবাই জানতো হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ট ভারতের সংগে যোগ দেয়ার চেয়ে স্বাধীন হলে ভালো হবে। তাছাড়া পাকিস্তানের সঙ্গে থেকে ভাইসুলভ আচরণের অভিজ্ঞতা ও ধরন দেখে ভারতের সঙ্গে যোগ দেয়ার বাসনা তাদের এমনিতেই মরে যায়।

উপমহাদেশে এখনো মুসলমানরা একটি শক্তিশালী ভিত নিয়ে দাঁড়াতে পারেনি। তবুও সম্প্রতি শেষ হওয়া পাকিস্তান-ভারত ক্রিকেট খেলার ধারা বিবরণী শুনতে ঢাকার লোকজনকে দোকানে ভিড় জমাতে দেখা গিয়েছে। সিলেটের একটি গ্রামের মসজিদে ভারতীয় কাশ্মীরবাসীর মুক্তির জন্য দোওয়া চাইতে দেখা গেছে। ১৯৮৯ সালে পেশোয়ারের এক পাঠান রাজনৈতিক নেতাকে সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে দেখেছি বাঙালীরা খারাপ - এ কথা বলাতে তিনি রেগে গিয়েছিলেন। তাকে জিজ্ঞেস করি কাশ্মীর স্বাধীন হলে পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং কাশ্মীর মিলে একটি কনফেডারেশন গড়লে কেমন হয় - কনফেডারেশনটি স্বাধীন রাষ্ট্রের মধ্যে হবে; তবে বিদ্যুৎ জ্বালানী, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পরস্পর পরস্পরকে সহায়তা দেবে। দশ বছরের জন্যও কি এ ধরনের কনফেডারেশন গঠন করা যায়না ? কনফেডারেশনের অধীনে ভারতের সঙ্গেঁ সকল দ্বিপাক্ষিক বিষয়গুলো কেবলমাত্র ইসলামাবাদ নিয়ন্ত্রণ করবে। দক্ষিণ এশিয় মুসলমানদের ভাগ্য হিসাবে কাশ্মীর সমস্যাকে বিবেচনা করে আমরা সবাই মিলে কাশ্মীর স্বাধীনতা আন্দোলনকে জোরদার করি না কেন ? এ ধরনের উদ্যোগ বাংলাদেশের সীমিত সম্পদের অভাব পূরণ করে অধিক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগসহ সুখী বাংলাদেশ গড়তে পারবে।

দি নেশন, ২১শে জুন ১৯৯১
মুস্তাফা মালিক

www.pathagar.com

পাঁচলাখ বাংলাদেশী নারী মানবেতর দিনাতিপাত করছে

গত সপ্তাহখানেক ধরে নারী পাচারকারীদের গ্রেফতারের খবর পত্র-পত্রিকায় বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে এবং মহিলা ও কন্যা শিশুদের বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে পার করে আনার ব্যাপারটিও আলোচনায় স্থান পাচ্ছে। ভারত এবং বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকায়ও নারী পাচার সম্পর্কিত বিভিন্ন খবরাখবর প্রতি দিনই ছাপানো হচ্ছে। মানুষের বিভিন্ন অঙ্গ - প্রত্যঙ্গ কেনা - বেচার খবরও বেশ আলোচিত হচ্ছে। এছাড়া পাকিস্তান সহ বিভিন্ন দেশের জেলে হাজার হাজার বন্দী পাচারকৃত নারীর করুণদশাও চিত্রিত হচ্ছে। অভিযোগ আছে, চাকুরী আর অর্থের লোভ দেখিয়ে পাচারকারীরা এসব মেয়েকে পাকিস্তান ও মধ্যপ্রাচ্যসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে পাচার করে আনছে। গত ক'বছর ধরে মানুষের অবৈধ পাচার এ অঞ্চলে অত্যন্ত আলোচিত বিষয়ে পরিণত হতে চলেছে।

পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকায় পাচার হয়ে আসা কমপক্ষে পাঁচ লাখ নারী রয়েছে যারা হয় গৃহভৃত্য অথবা দেহ পেশায় নেমেছে; নিষিদ্ধ পল্লীতে বাস করছে। বাংলাদেশ সরকারও এ বিষয়ে ওয়াকেফহাল । এক ধরনের সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় এসব নারীর বেশির ভাগই দালালদের খপ্পরে পড়ে পাকিস্তানে আসে। বেনজীর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে বন্দী এ সব বাংলাদেশীয় সরকারের কাছে তাদেরকে মুক্তি দানের আবেদন জানায়, পাকিস্তান মুক্তির বিষয়টি সমাধা করার চেষ্টা করলেও বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে এ ধরনের কথা এখনো উঠেনি।

৯০ এর মাঝামাঝি পত্র -পত্রিকার রিপোর্টে দেখা গেছে 'খাটাক' জেলে বহু সংখ্যক বাঙালী রমণী রয়েছে। ভারতের বিভিন্ন জেলেও এ রকম বহু বাঙালী রমণী আছেন। বাংলাদেশ পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, বিভিন্ন দেশের জেলে কমপক্ষে ২০-২৫ হাজার বাঙালী রমণী রয়েছেন এবং তাদেরকে ছাড়িয়ে আনার জন্য তারা কাজ করছেন। পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে নারী ও শিশু পাচার বন্ধের জন্য প্রধানমন্ত্রী বেনজীর ভুট্টো ক্ষমতায় থাকাকালে আইনমন্ত্রী আনসার বার্নী এবং আসমা জিলানীকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। বেনজীর সরকারের পতনের পর পরই এ কমিটি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। আনসার বার্নী কল্যাণ ট্রাস্টের সূত্র বলেছে, গত দশ বছরে নারী, শিশু ও পুরুষসহ পাকিস্তানের বিভিন্ন জেল থেকে ২৫ হাজার লোকজনকে ছাড়ানো হয়েছে, এছাড়া পাকিস্তানের করাচী ও বিভিন্ন শহরের বস্তিতে কমপক্ষে পাঁচ লাখ বাংলাদেশের নারী রয়েছে। এ ধরনের বেআইনী বসত ও দেহ পেশা সম্পর্কে পুলিশ ও প্রশাসন অবগত আছেন। যারা বস্তির মালিক অথবা বিভিন্ন স্থানে কাজের উদ্দেশ্যে যাওয়া লোকের কাছ

www.pathagar.com

থেকে মাসোহারা পায় এবং এ ব্যাপারে চুপ থাকে। পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকায় অবৈধ বসবাসকারী এসব রমণী বা মহিলারা সর্বদা ভীত থাকেন কখন আবার বিদেশের মাটিতে ধরা পড়ে যান। ইসলামী আইনে পতিতা বৃত্তি বেআইনি, ফলে তারা সব সময় শংকা গ্রস্ত থাকে। এসব নারীরা বিভিন্ন এলাকার কারখানা এবং গৃহে কাজ করে থাকে। মানবাধিকার সংস্থা 'লইয়ার্স ফর হিউম্যান রাইটস লিগ্যাল এইডস এসোসিয়েশন' (লারলা) এবং ' আনসার বার্নী ওয়েল ফেয়ার রাইটস' গত বছর কয়েকজন বাঙালী রমণী ও শিশুকে জেল থেকে ছাড়িয়ে তাদের নিজের দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু হাজার হাজার বাঙালী রমণী শিশু আইনগত ও আর্থিক সহায়তার অভাবে এখনো জেলে পড়ে আছেন, সাহায্যের আশায় রয়েছেন। বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা সূত্রে জানা গেছে প্রতি মাসে বাংলাদেশ থেকে কমপক্ষে দু'শ থেকে পাঁচ'শ নারী পাচার হয়ে পাকিস্তানে আসছে এবং ৮০ সালের পর থেকে এ সংখ্যা বাড়ছে।

সব রকম অবৈধ পাচারের জন্য একটি আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক কাজ করছে। বার্মা, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল এবং বাংলাদেশের শক্তিশালী বিভিন্ন গ্রুপ নারী পাচার করে বেড়াচ্ছে। আঞ্চলিক অফিস থেকে নিজস্ব নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে তারা নিজ নিজ দেশ থেকে নারী ও শিশু সংগ্রহ করে চাকুরী দেয়ার নাম করে করাচীতে মোটা দামে দালালদের কাছে বিক্রি করে দেয়। এদের অনেককে দালালরা কলকাতা ও বোম্বের বিভিন্ন পতিতালয়ে বিক্রি করে, আবার একটু সুন্দরী হলে চড়া দামের জন্য আরব রাষ্ট্রগুলোতে পাঠিয়ে দেয়। সুন্দর ও পছন্দসই নারীর মূল্য সেখানে এক থেকে দু'হাজার ডলার পর্যন্ত হয়ে থাকে। এক মহিলা জানালেন, দশ থেকে বার বছর বয়সের অনেক মেয়েকে গর্ভবতী অবস্থায় পাওয়া যাবে - যারা দালালদের অথবা সীমান্ত পুলিশের হাতে ধর্ষিতা হয়েছেন। লারলা কর্তৃপক্ষ জানায়, এখন হুদুদ অধ্যাদেশ (Hudood Ordinence) এর আওতায় করাচি জেলে ৪০ জন নারী ও শিশু আটকা পড়ে আছে। তাদের দাবী এ ধরনের অমানবিক ও অবৈধ নারী পাচার বন্ধ করা হোক এবং যারা আছে তাদের নিজ জন্মভূমি বাংলাদেশে ফিরিয়ে দেয়া হোক।

দি নিউজ, জানুয়ারী ১৮, ১৯৯১
মাহনাজ কাজিম

www.pathagar.com

ধ্বংসের পথে পাকিস্তান
নতুন অধ্যায়ের সূচনা

পাকিস্তানের ২৪ বছরের রাজনৈতিক টানা-পড়েন, পাকিস্তান অবস্থায় পূর্ব ও পশ্চিম অংশের সম্পর্ক ক্রমশ ধুমায়িত হয়ে যাচ্ছিল। আর '৭১ এর ১৬ই ডিসেম্বর তা চূড়ান্ত পরিণতির মাধ্যমে সমাধান হলো। পাকিস্তান ভেঙ্গে টুকরো হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের ধ্বংসস্তুপের উপর বাঙালীরা প্রতিষ্ঠিত করলো স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। পাকিস্তান সরকার শুরু থেকেই বাঙালীদের সাথে বিমাতাসুলভ আচরণ করে আসছিল। পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখার জন্য উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রচেষ্টা করেছে পাকিস্তান সরকার। কিন্তু উর্দু ভাষায় রেডিও টেলিভিশনে প্রচারিত সংবাদে পশ্চিম-পাকিস্তানীদের পশ্চিমী এবং পূর্ব-পাকিস্তানের অধিবাসীদের পূর্বের বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিপরীত পক্ষে বাঙালীরা এতে ক্ষুব্ধ হয় কারণ রেডিও টেলিভিশনে জাতীয় মাধ্যম হওয়া সত্ত্বেও সেখানে বাংলাভাষার ব্যবহার করা হতোনা। শুধু তাই নয় বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়ার দাবিও উঠে প্রথম থেকে। আইয়ুব খান একবার ঢাকায় গিয়ে জনসভায় ভাষণ দান কালে বাংলায় কতগুলো শব্দ উচ্চারণ করলে বাঙালীরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছেন। বিশেষত বাংলাভাষা পাকিস্তানীদের মানায়না, এই কারণে। এই পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় ঐক্য সুদৃঢ় করার জন্য শিক্ষাবৃত্তি, ভাষা শিক্ষাসহ বিভিন্ন প্রচেষ্টার জোরদার করা হয়।

আইয়ুব শাসনামলে যারা পূর্ব পাকিস্তানে থেকেছি তারা বলতে পারি আইয়ুব বাংলা ভাষা সংস্কারে যেসব সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তা প্রায়ই উৎকট ও উদ্ভট। শুধু তাই নয় আইয়ুব খানের প্রচারণাও ছিল হাস্যকর। তাছাড়া পাকিস্তানীরা প্রায় সময়ই তাদের ডিনারপার্টিসহ বিভিন্ন জনসভায় বলতেন তিনটি বিষয়ই পাকিস্তানকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে পারে। সেই তিনটি হলো, ক) ইসলাম খ) ইংরেজি ভাষা এবং গ) পিআইএ। তাছাড়া পশ্চিমা বুরোক্র্যাটসহ রাজনীতিবিদরা বাঙালীদের চিন্তা ভাবনার সম্ভবত সামান্যতমটুকুও খোঁজ খবর নিতনা। মূল জনগণের চিন্তা চেতনা থেকে শাসকরা ছিলেন অনেক দূরে। সাদামাটা দৃষ্টিতে মনে হতো সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালীদের একই দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেন। তাদের ধারণা, বাঙালীরা উত্তম মুসলমান নয়, কেননা তারা আজও রবীন্দ্র সঙ্গীত, নাচ, গানসহ যাবতীয় হিন্দু সংস্কৃতি লালন করে। তাছাড়া বাংলাভাষার সঙ্গে হিন্দি ভাষার একটি সংযোগ রয়েছে, শুধু তাই নয় বাংলাভাষার পঠন-পাঠনও সংস্কৃত ভাষার ন্যায়। দ্বিতীয়তঃ বাঙালীরা হলো বেঁটে, কালো, কুচকুচে, শীর্নকায় দেহের যারা তাদের পাকিস্তানী নাগরিকদের তুলনায় অত্যন্ত দুর্বল। তৃতীয়তঃ বাঙালীরা দেশ শাসনের অযোগ্য, দেশ

www.pathagar.com

শাসন করার মত কোন যোগ্যতা নেই। বাঙালীরা আবার সাহসী। এসব দিক বিবেচনা করে পাকিস্তানীরা চিন্তা করতেন বাঙালীরা কখনো পশ্চিম-পাকিস্তানীদের সমকক্ষ হতে পারেনা। এসব পরিণতির মধ্য দিয়ে সামরিক শাসক আইয়ুব খানের পতনের পর পরই ১৯৭১ সালে চূড়ান্ত কথা বলার সময় এসে গেলো, ফলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সম্পর্কের ক্ষেত্রে ক্যান্সার সদৃশ একধরনের বৈরিতার জন্ম নেয়। পূর্ব ও পশ্চিমের এই মানসিক দুরত্বের দুরন্ত ক্যান্সারে '৭১ সালে রক্তাক্ত একটি অধ্যায়ের জন্ম নিল, পূর্ব কিংবা পশ্চিম-পাকিস্তানী রাজনৈতিক নেতৃত্বের কেউ এই বিষয়টিকে সমাধানের পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারেনি। তাছাড়া পশ্চিমা বুর্জোয়াদের কার্যকলাপের কারণে বাঙালীরাও পিছু হটে আসতে তখন রাজি হয়নি।

এসব জটিল ও ধুমায়িত সমস্যা, ভাবনা-চিন্তার তফাত ও চাওয়া-পাওয়ার ফসলসহ নানা বৈপরীত্য ও পারস্পরিক সন্দেহের কারণে '৭১ এর উদ্ভুত পরিস্থিতিকে প্রকৃত প্রেক্ষিতে মূল্যায়ন করা সমীচীন হবে তা কেউ চিন্তা করতে পারেনি। ল্যুব্স ও রিচার্ড সীজান এই ভয়াবহতম পরিস্থিতিকে এবসার্ডধর্মী বা বিমূর্ত থিয়েটারের সঙ্গে তুলনা করেছেন তাদের বিখ্যাত ওয়ার এন্ড সেসন (*War and Secession*) গ্রন্থে। কয়েকটি উদ্ধৃতি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। ২০শে নভেম্বর যখন ভারত পাকিস্তান আক্রমণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় তখন আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট হাউসে এই পরিস্থিতিতে কি করণীয় তা নিয়ে জরুরী বৈঠকে হাত উঁচু করে বলেন, "এই মুহূর্তে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য একমাত্র প্রার্থনা ছাড়া আমি আর কি করতে পারি"। এই কথাটি *পাকিস্তানস ক্রাইসিস ইন লীডারশীপ* এর লেখক মেজর জেনারেল ফজল মুকীন খান তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া ৩রা ডিসেম্বর যখন ভারতীয় বিমান বাহিনী পাকিস্তানী বিমান বাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হয় তখন নৌ সেনারা জানতে পারেন সেই আক্রমণ সার্থক হচ্ছে। অপরদিকে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী জানতে পারেন যে, তাদের ইউনিট ধ্বংস প্রাপ্ত হচ্ছে এবং ক্ষেত্রবিশেষে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। অপরদিকে আক্রমণের ঐ সময় বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের তথ্য পাওয়া যাচ্ছিল। বিশেষত করাচি থেকে রাওয়ালপিন্ডি কিংবা ঢাকার বিভিন্ন ইউনিটগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল সম্পুর্নরূপে বিভ্রান্তমূলক। আর্মির জেনারেল হেড কোয়ার্টার (জিএইচকিউ) থেকে ৫ই ডিসেম্বর তথ্য পাঠানো হয়, অল্পক'দিনের মধ্যে চীনা বাহিনীর সহায়তা পাওয়া যাচ্ছে। আবার ১২ই ডিসেম্বর লেঃজেঃ গুলহাসান জিএইচকিউ এর স্টাফ প্রধান হিসেবে টেলিগ্রাম পাঠান যে, দক্ষিণ এবং উত্তর থেকে সাদা বন্ধু তথা চীন ও মার্কিন সৈন্যরা আসছে। নিয়াজী এই তথ্য পশতু ভাষায় পেয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এই তথ্যও ছিল ভুল, পরে প্রমাণিত হয়েছিল। এই দুই ঘটনার পর থেকে প্রায় সমস্ত ঘটনা পারস্পরিক সন্দেহ ও উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করে এবং পুরো যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দেয়।

www.pathagar.com

এক পর্যায়ে খোদ ইহাহিয়া খান তার তথ্য অধিদপ্তর থেকে জানতে চান, বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত মার্কিন সপ্তম নৌ বহরটির কি অবস্থা এবং তা এখন কোথায় আছে।

যুদ্ধকালীন পঞ্চম ঘটনাটি হলো ডিসেম্বরের ১৫ তারিখ পাকিস্তানী সৈন্যরা পরের দিন আত্মসমর্পনের চিন্তা ভাবনা শুরু করেছে, তখন বিদেশি এক সাংবাদিক ইন্টার সার্ভিস পাবলিক রিলেসান্স প্রতিনিধির সঙ্গে আলাপকালে জানতে চেয়েছেন যুদ্ধে কারা জিতেছে তখন ঐ প্রতিনিধি সরাসরি উত্তর দিলেন ফোনে "আমরাই জিতছি" এবং বলার ধরনটি ছিল অত্যন্ত দৃঢ় চিত্তের। অতএব তথ্য আদান প্রদান ও ঘটনা বিশ্লেষণের দুর্বলতা সহজেই ধরা পড়ে। পরবর্তি ঘটনাটি ছিলো ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তান সরকারী বাহিনী যখন আত্মসমর্পন করলেন তারপরে ১৯শে ডিসেম্বর হঠাৎ করে পাকিস্তানকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা দেয়ার ব্যাপারটি চূড়ান্ত করা হয়। মাত্র ১৫ মিনিট পরই আবার সেকথা উচ্চারণের জন্য বারণ করা হয়। কেননা সেই সময় ইয়াহিয়া খানের ঐ ঘোষণার সিদ্ধান্তটি একান্তই হাস্যাস্পদ হতো। সপ্তম ঘটনাটি হলো, ভারতীয় সেনাবাহিনী আত্মসমর্পনের যে সীমা নির্ধারণ করেছিল পাকিস্তানের সেনা অফিসারেরা তখন এক জরুরি বৈঠকে মেতে উঠেছিল। ফলে গ্রীনিচ মিন টাইম সীমারেখা শেষ হয়ে যায়। ভারতকে পাকিস্তান সরকার ও নীতি নির্ধারক মহল ঐ সময় তেমন গুরুত্বের সঙ্গে বিচার না করায় ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয় এবং ভারত তখনি পাকিস্তান আক্রমণ করে বসে। সময়ের এই সীমারেখাটি পাকিস্তানের ভাঙ্গনে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইল ফলক। পাকিস্তান-ভারতের সঙ্গে বিস্তারিত আলাপ না করার সিদ্ধান্তে মারাত্মক ভুল করে যা ভারতকে প্রায় বিনা বাধায় পাকিস্তান আক্রমনের সুযোগ করে দেয়। সোজা কথায় বলা যায় পূব-পাকিস্তান সমস্যার ব্যাপারটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কার্যকারণ, কিংবা রাজনৈতিক সামরিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অদুরদর্শীতার ফসল। আজকের পাকিস্তানী জনগণ মনে করেন, সে সময় পাকিস্তান সরকার পূর্ব-পাকিস্তান সম্পর্কে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করে তার সবগুলোই ছিল অনৈতিক ও ভুল। আর যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেয়া ছিল পাকিস্তান নীতি নির্ধারকদের অন্যতম মারাত্মক ভুল। নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়েও আইয়ুব খান এক জুনিয়র অফিসারকে বলেছিলেন "পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তিযুদ্ধের চাবিকাঠি ভারতের হাতে। যে কোন মুহূর্তে তাই ভারত পাকিস্তান আক্রমন করবে"। অপরদিকে ভুট্টো চীন সফর শেষে লাহোরের মসজিদ-ই-সুহাদার সম্মুখে এক জনসভায় বলেছিলেন, এই যুদ্ধ ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধ নয়। যদি পাকিস্তান-ভারতের যুদ্ধ হতো তবে এই যুদ্ধের দামামা হতো "ধামাধাম মাস-কালান্দার"। এই ধরনের বিপরীতধর্মী বক্তব্য পাকিস্তানের সাধারণ সৈনিকদের হতভম্ব ও সন্দেহের দোলায় দুলিয়েছে।

www.pathagar.com

১৯৭৩ সালে ভুট্টো যখন যুক্তরাষ্ট্র সফর করছিলেন তখন "আল-হারাম" পত্রিকার এক সাংবাদিক বলেছিলেন, "যুদ্ধের সময়ে নভেম্বরে ভুট্টো তাঁর ইন্টারভিউ দিয়ে আমাকে প্রতারিত করেছিলেন"। সেই সাংবাদিক আরো বলেছিলেন, "আমি আমার সাংবাদিকতা জীবনে এতো বড়ো ভুল কখনো করিনি"। তিনি বলেন, "রেডিওতে সাক্ষাৎকার নেয়ার সময় ভারতের প্রসঙ্গটি উল্লেখ করলে ভুট্টো বলেছিলেন যদি সে ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো তাহলে আমি কি ক্যারিওতে এসময় অবকাশ যাপনে আসতাম ?" তাছাড়া পাকিস্তান কখনো চিন্তাই করেনি যে ভারতীয় সেনাবাহিনী কিংবা ভারত সরকার পূর্ব-পাকিস্তানকে সরাসরি একটি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেবে। ইয়াহিয়া খান ও তার সঙ্গীদের ধারণা ছিল ভারত যেকোন সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে মার্কিন সরকারের গোয়েন্দারা তা জানবে এবং সেই মোতাবেক পাকিস্তান সিদ্ধান্ত নেবে। কিন্তু ভারতের পররাষ্ট্রনীতির কাছে পাকিস্তানের নীতিনির্ধারক গোষ্ঠি কিংবা আমেরিকান গোয়েন্দা মার খেয়ে যায় অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে। শেষ ভুলটি সম্ভবত ঐখানে পাকিস্তানের শাসক নেতৃত্ব দিয়েছে যা আর সোজা করা সম্ভব নয়। আর এই মেরুদন্ডহীন বাঙালী পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়বে; প্রশ্নই আসেনা। বাঙালী সম্পর্কে এ ধারণা ছিল মামুলী ও ভুল। কিন্তু '৭১ এর সেই চরম দিনগুলোতে আত্মনুসন্ধান কিংবা ঘটনাগুলোর কার্যকারণ বিশ্লেষণ করার সময় ছিলনা। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে ঘটনার ব্যাখ্যা করাও ঐ সময়ে ছিল দুরূহ। বাস্তব অবস্থা কি তা নিয়েও কারো কোন মাথাব্যথা দেখা যায়নি। বর্তমানে বিশ্বাস করা হয় যে, পাকিস্তান ভাঙ্গার প্রথম কারণটি হলো জুলফিকার আলী ভুট্টোর ক্ষমতা লোভ। গণতান্ত্রিক নির্বাচনে শেখ মুজিব সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলেও ভুট্টো নানা অজুহাতে শেখ মুজিবের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে অস্বীকৃতি জানায়। ভুট্টোর যে কোন ভাবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার বাসনা ও কার্যক্রম বাঙালীদের হতবাক করে দেয়। ভুট্টোর এই হঠকারীতা পাকিস্তান ভঙ্গের অন্যতম কারণ। জানুয়ারির তিনটি ঘটনা ভুট্টোর ক্ষমতালিপ্সু চরিত্রকে সুস্পষ্ট করে তোলে। তিনি প্রাক্তন বিচারপতি এস এম মোরশেদকে বলেছেন, এ ধরনের অবাস্তব পাকিস্তানের শেষ হওয়া উচিত। আমার মনে হয় এভাবে দুই পাকিস্তান একসঙ্গে চলতে পারেনা। তাছাড়া তৎকালীন মার্কিন এসোসিয়েট প্রেস এর ব্যুরো প্রধান আরনল্ড রেইটলীন কে তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, "পাকিস্তানের দুই অংশের জন্য দুটি সংবিধান থাকা উচিত"। তথা দুই পাকিস্তানে থাকবে দুটি সংবিধান। '৭১ এর ১৭ ও ১৮ই জানুয়ারি লারকানার আলমরতুজায় ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে আলোচনাকালে ভুট্টো বলেছিলেন "মুজিব একটা বাস্টার্ড, এবং গোঁয়ার। আইনের তোয়াক্কা করেনা"। আবার তাকে খাঁটি পাকিস্তানী হিসেবে উল্লেখ করে বলেন 'মুজিবের কিছুতেই এসেম্বলী ত্যাগ করা উচিত নয়'। '৭১ এ ভুলের আর একটি কারণ হলো বাঙালী সম্পর্কে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ভুল ধারণা। বাংলাদেশকে কলোনীতে পরিণত করার চিন্তায় সবসময় এরা ছিলেন সোচ্চার।

www.pathagar.com

ঔপনিবেশিকতা টিকিয়ে রাখার জন্যই বারবার সামরিক শাসন কায়েম করেছে। যখন নভেম্বরের মাঝামাঝি একসময় পূর্ব-পাকিস্তানের এক বুর্জোয়া জেনারেল ইয়াহিয়াকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'স্যার, পূর্ব-পাকিস্তান বোধ হয় হাত ছাড়া হয়ে যাচ্ছে। এব্যাপারে আমাদের কিছু করা উচিত', ইয়াহিয়া খান তার প্রতি উত্তরে বলেছিলেন, 'ভুলে যান সব, এসব কালো বাঙালীদের সঙ্গে যুদ্ধ করে আমাদের কোন গৌরব নেই, লাভও নেই'। এই বাঙালীর চরিত্র নিয়ে লিখতে গিয়ে আইয়ুব খান তার 'প্রভু নয় বন্ধু' বইতে বলেছেন, 'বাঙালী জাতি বড়ই স্বার্থপর। তারা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সব সময় কোন না কোন হাঙ্গামায় লিপ্ত থাকে। তারা স্বাধীন বাংলাদেশ গঠন করবে, এ কখনো সম্ভব নয়, কারণ তাদের চিন্তা-চেতনায় যথেষ্ট তফাৎ রয়েছে। একইভাবে যুদ্ধকালীন একজন বিগ্রেডিয়ার পাকিস্তানের পক্ষ হয়ে '৭১ সালের মার্চ মাসে বাংলাদেশে থেকে পাকিস্তানে ফিরে এসে বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, যারা বা যেসব বাঙালী জুনিয়র অফিসারেরা বিদ্রোহ করে বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য লড়েছিল তাদের কাছে আমরা ছিলাম শত্রু, তারা এমনকি আমাদের পরিবার পরিজনকেও ক্ষমা করতো না। তখন পাকিস্তানী একটি পত্রিকার সম্পাদক ২৫শে মার্চ এর সামরিক পদক্ষেপ সম্পর্কে বলেছিলেন যদি বাঙালীরা মনে করেন যে, পাকিস্তান পূর্ব অংশে আধিপত্য টিকিয়ে রাখার জন্য সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করছে তবে সামরিক বাহিনীর কার্যক্রমে বাধা আসবে এমনকি অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাও মুশকিল হতে পারে। অতএব সাবধানে পদক্ষেপ না নিলে চরম ভুল হতে পারে যার পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ।

শক্তিশালী পশ্চিমা বাহিনীর পরাজয়ের তৃতীয় কারণটি হলো যুদ্ধকালীন ভুট্টো ও ইয়াহিয়ার দ্বন্দ্ব, দূরত্ব ও সন্দেহ প্রভৃতি। ভুট্টোর অদূরদর্শী সিদ্ধান্ত, সর্বোপরি ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানের পতনের পর ভুট্টোর একমুখো সিদ্ধান্ত। এই দুটো ঘটনা ছিল পরস্পর সম্পৃক্ত ঘটনাবলী, সেই অভ্যুত্থানে ইয়াহিয়া খানের বিরুদ্ধে সিনিয়র অফিসারেরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং জাতির সঙ্গে বেঈমানীসহ, পাকিস্তান ভাঙ্গার অপরাধে তাকে অভিযুক্ত করে। রাওয়ালপিন্ডির অদূরে গুজরনাওয়ালায় এক বিগ্রেড প্রধান বিগ্রেডিয়ার এফ,বি আলী তার অধিনস্থ তিনজন জেনারেলকে গ্রেফতার করেন। তারা হলেন মেজর জেনারেল আর ডি, শামীম বাচ্চু, করিম এবং বশীর মুহাম্মদ খান। বিগ্রেডিয়ার আলী এজন্য তার দু'জন সিনিয়র অফিসার কর্তৃক প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। কর্নেল আলীম আফ্রিদী (যিনি ছিলেন এয়ার মার্শাল আজগর খানের শ্যালক) আর্মি ষ্টাফ প্রধান লেঃ জেঃ গুলহাসানকে বলেছিলেন যদি ইয়াহিয়া ও তার বাহিনী থেকে চলে আসেন তবে আমরা আপনার বিরুদ্ধে লড়বো। সেনাবাহিনীতে সংগঠিত দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ন ঘটনাটি হলো রাওয়ালপিন্ডির আর্মি হেডকোয়ার্টারে। সেখানে ইয়াহিয়া খান যখন অপারগতা প্রকাশ করে জেনারেল আব্দুল

www.pathagar.com

হামিদ খানকে সেনা প্রধান নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন তখন তিনি চেষ্টায় ছিলেন কি করে অন্যান্য আর্মি স্টাফদের তার অনুগত রাখা যায়। এই ঘটনা আর্মি অফিসারদের মধ্যে নানা মতদ্বৈততার সৃষ্টি করে। বিশেষত সেনাবাহিনীর লেঃ জেঃ গুলহাসান এবং বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার মার্শাল রহিম খান অত্যন্ত সুচতুরভাবে ইয়াহিয়া খানকে সরিয়ে সর্বময় ক্ষমতার কান্ডারী হিসেবে ভুট্টোকে অধিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন।

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরে পাকিস্তান ভেঙ্গে গেলে পাকিস্তান ভাঙ্গার কারণ তদন্তের জন্য হামদুর রহমানের নেতৃত্বে এক সদস্যের একটি তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়। সেই কমিশন পাকিস্তানের বিভাজনের ১০টি সুনির্দিষ্ট কারণ বের করেন এবং কিছু সুপারিশ করেন। এরমধ্যে ১৯৬৯ এর ২৫ শে মার্চ আইয়ুব খানের পতনের জন্য কয়েকজন আর্মির ষড়যন্ত্রকে দায়ী করে তাদের শাস্তিদানের সুপারিশটি ছিল অন্যতম। এই ষড়যন্ত্রকারী অফিসারেরা হচ্ছেন ইয়াহিয়া খান, হামিদ খান, এস.জি.এম.এস. পীরজাদা, গোলাম ওমর, গুল হাসান এবং মিঠা খান। তারা রাজনৈতিক দলগুলোকে উস্কে দিয়ে আইয়ুব খানকে ক্ষমতাচ্যুত করেছেন, একইভাবে তারাই পাকিস্তান ভাঙ্গার জন্য দায়ী; সেই সুপারিশে উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের প্ররোচনায় ভুট্টো ৩রা মার্চ জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে যোগ দেননি, সুপারিশে এই অভিযোগও করা হয়েছে। এই কমিশনে আরো সুপারিশ করা হয়, বাঙালী জনগণকে উস্কে দেয়ার জন্য এসব সামরিক অফিসারদের ভূমিকা ছিল সর্বাপেক্ষা মারাত্মক। তারা পাকিস্তানের নিরাপত্তার অজুহাতে বাঙালী জনতাকে আক্রমণ করে বসে, শুধু তাই নয় আর্মিদের এসব হটকারীতামূলক সিদ্ধান্তের কারণে সরকারসহ সর্বস্তরের প্রশাসনিক কর্মকান্ডে সেদিন অসহযোগ ও বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়েছিল, যা রোধ করা ছিল দুঃসাধ্য। প্রকৃত পক্ষে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা হলো ইতিহাসের অমোঘ পরিণতি। বাংলাদেশ সৃষ্টির নেপথ্য নায়ক হলেন ভুট্টো, মুজিব ও ইন্দিরা, এই সুচতুর তিন রাজনীতিবিদ। যারা ধবংসকে ইয়াহিয়ার মৃত কফিনের মতো নিঃশেষ করে দিতে চেয়েছিলেন। অথচ আজকের দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত - বাংলাদেশের জনগণের চক্ষুশূল। অন্যদিকে বাংলাদেশ-পাকিস্তান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার হতে চলেছে। কিন্তু সম্পর্কের অগ্রগতিতে মূলবাধা '৭১ এর ট্রাজেডি। অপরদিকে '৭১ সালের যুদ্ধ জয় এ পাকিস্তান বাহিনী ভারতের জগজিৎ সিং অরোরার কাছে আত্মসমর্পন করে। কলকাতা থেকে ঢাকায় আসার আগে অরোরা এই ঐতিহাসিক ঘটনাকে স্মরণীয় করার জন্য কলকাতায় সবচেয়ে বড় একটি নিবের কলম চেয়েছিলেন। অথচ সেই ভারতের একান্ত অনুগত শিখরা আজ ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য আন্দোলন করছেন। খালিস্তান নামক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য পাকিস্তানের সঙ্গে গোপন সম্পর্ক পাতানোর জন্য চেষ্টা করছে। তারা ভারতের হিন্দু রাজ্য থেকে নিজেদের সম্পুর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন মনে করছেন। কিন্তু

www.pathagar.com

একাত্তরের সেই ঘটনার কথা স্মরণ করা হলে সত্য বলা প্রয়োজন, মিথ্যাচারের জটাজাল ছিঁড়ে সত্য বের করে আনতে পারলে পাকিস্তানী জাতির সেদিনকার ভূমিকা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে যাবে। সেদিনের সত্য তথ্য উৎঘাটিত হলে দেখা যাবে বাঙালী জাতীয়তাবাদের জন্য নয়, পাকিস্তানী রাজনৈতিক দল ও সামরিক বাহিনীর কিছু দায়িত্বহীন সর্বোপরি অনৈতিক সিদ্ধান্ত পাকিস্তানকে ভেঙ্গে বাংলাদেশ ও পাকিস্তান এ দুটো রাষ্ট্রের ভিত্তিভূমি রচনা করেছে।

আসলে বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূল ঘটক ছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, আর সোভিয়েট প্রধান লিওনিদ ব্রেজনেভ ছিলেন নিয়ন্ত্রক। আইয়ুব, ভুট্টো, ইয়াহিয়ার অদূরদর্শী সিদ্ধান্ত এবং মজিব-ভুট্টোর দ্বি-ভিন্নক রাজনীতি '৭১ এর মতো একটি দুঃখজনক মুহূর্তের ক্ষেত্র তৈরি করে যা বাঙালীকে স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে উদ্বেল করে তোলে। অবশ্য শেখ মুজিবের অবিসংবাদিত নেতৃত্বও বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার অন্যতম একটি কারণ। কিন্তু এক্ষেত্রে শত্রুতার চেয়েও স্বাজাত্যবোধটি কাজ করেছে অনেক বেশি। আসলে ভারতের কাশ্মীর, পূর্ব-পাঞ্জাব, আসাম আজ যে অবস্থায় আছে বাংলাদেশও তখন ছিল একই অবস্থায়। পাকিস্তান এসব সমস্যাকে '৭১ এর দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করছে। কিন্তু বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ২০ বছর পরও বলা যাবে না- ইতিহাসের চাকা থেমেছে। ইতিহাসের বৃত্ত তৈরী হয়েছে এই অঞ্চলের রাজনৈতিক ধারা-প্রক্রিয়া। বড়ই বিচিত্রতর ঘটনারাজী তার বড় সাক্ষ্য বড় প্রমাণ পাকিস্তানের বিভক্তি, একটি বাংলাদেশ ।

দি হেরাল্ড, ডিসেম্বর ১৯৯১
মুসাইদ হোসাইন।

www.pathagar.com

সেই ট্রাজেডির ইতিবৃত্ত

পাকিস্তানের ইতিহাসে ১৯৭১ এর ঘটনাকে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা মনে করা ভুল হবে। পাকিস্তানের জনগণকে এজন্য এককভাবে দায়ী করাও ভুল হবে। যদি সেরকম কেউ করে থাকে তবে পাকিস্তান ভাঙ্গার ইতিহাস ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে তাদের ধারণা তিমিরেই থেকে যাবে, তারা হবেন অজ্ঞ। পূর্ব পাকিস্তানের পতন আজ ২০ বছর হলেও নিরপেক্ষভাবে সেই ঘটনার কারণ ও প্রেক্ষিত কেউ তুলে ধরেননি - এই মন্তব্য '৭৪ সালে ঢাকা থেকে ফিরে আসা ফয়েজ এর। পাকিস্তান পতনের প্রকৃত গতিপ্রকৃতি এবং ঘটনারাজী বিশ্লেষণ করে প্রকৃত সত্য অনুসন্ধানে আজো কেউ এগিয়ে আসেনি। পাকিস্তান ও ভারত প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, পাকিস্তানের রাজনীতি, পূর্ব পাকিস্তানের অভিযোগ, রাজনৈতিকও অর্থনৈতিক বৈষম্য, নির্বাচন, সামরিক শাসনের প্রভাব, সর্বোপরি '৭১ এর আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ঘটনার গতিপ্রকৃতি, বাঙালীদের স্বতন্ত্র আবাসভুমি প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধ, পাকিস্তান সেনা বাহিনীর অমানুষিক অত্যাচার, লুটপাট, অগ্নি সংযোগ, নারী ধর্ষণ, ভারতের সহযোগিতা, পরাশক্তির ঠান্ডা লড়াই এর ফলে, ভারতীয় আক্রমণ এই সবগুলোকে বিচারে এনে তারপর বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা তথা পূর্ব-পাকিস্তানের পতনকে বিচার করলে হয়তো সেই ইতিবৃত্তের জটাজাল খোলা সম্ভব হবে। সেদিনের নানা দৃষ্টান্ত ও সত্যের প্রতি একান্ত অনুগত থেকে এসব বিশ্লেষণ করতে হবে। প্রকৃত পক্ষে এতো ব্যাপক তথ্য সংগ্রহ কিংবা নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ করা বাস্তবে সম্ভব কিনা, বলা মুশকিল। তবে কোন সংগঠন যদি এ ব্যাপারে এগিয়ে আসে তবে হয়তো প্রচুর সম্ভাবনা থাকবে। এ ধরনের বাস্তবতাকে বের করা সম্ভব হলে ফয়েজ এর কথাকে মিথ্যা প্রমাণ করা যাবে-অন্যথায় নয়। ভারতের হস্তক্ষেপ, উদ্বাস্তুদের সাহায্যে এগিয়ে আসা, জাতিসংঘে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য জোরালো বক্তৃতা, পাকিস্তানী নেতাদের 'এদারহাম ওধার ফাম' এ ধরনের দাম্ভিক নীতি, বাঙালী মুক্তিযোদ্ধা ও রাজনৈতিক নেতাদের অসম সাহসিকতা, মনোবল, আঘাত, দেশপ্রেম, স্বাধীনতা লাভের জন্য বিদ্রোহ, সর্বোপরি সশস্ত্র আন্দোলন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা তথা পূর্ব-পাকিস্তানকে পতনের পথ সুপ্রশস্থ করে তোলে। কিন্তু শেষের দিকে পাকিস্তান ভেঙ্গে যাওয়ার জন্য পাকিস্তানী জনগণ ও রাজনৈতিক সামরিক নেতারা অনুশোচনা করতে থাকে। এবং তারা পাকিস্তান ভাঙ্গার মূল কারণ কোথায় তা অনুসন্ধানে ব্রতী হয়। কিন্তু আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে, হারানোর ব্যথাতুর হৃদয়ে তখন কেউ পাকিস্তান রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসেনি। অনেকটা প্রথম হবার পর দ্বিতীয় স্থানে চলে যাওয়ার মতো অভিজ্ঞতা হচ্ছিল।

www.pathagar.com

আজ বাংলাদেশে আটকে পড়া পাকিস্তানী তথা বিহারীদের ফেরত আনার ব্যাপারে যেমন পাকিস্তান শ্যাম রাখি না কুল রাখি নীতি কিংবা বলতে পারি 'বধির নীতি' অনুসরণ করছে। একইভাবে '৭১ এ 'চোরে শুনেনা ধর্মের বাণী' এ রকম একটা ভাব ছিল। বর্তমানে সিন্ধু নিয়ে সে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এর যে জটিল পরিণতি হবে না তা বলা এই মুহূর্তে মুশকিল। যদি সেদিনকার পূর্ব পাকিস্তানের মতো অদূরদর্শী সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তবে পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসে এটি হবে চরম আর একটি ভুল। আইনগত ও নীতিগতভাবে পাকিস্তান সরকারকে সিন্ধু প্রদেশ সম্পর্কেও এই ধরনের অত্যন্ত সহনশীল একটি সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কোন রকম সংঘাতে যাওয়া উচিত হবেনা। কাশ্মীর এখন প্রায় একই সমস্যা সৃষ্টি করেছে। কাশ্মীর সম্পর্কে কোন ভুল সিদ্ধান্ত তাদেরও বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে। অবশ্য কাশ্মীর এর এহেন পরিস্থিতির জন্য কাশ্মীরের জনগণ দায়ী নন, এরজন্য দায়ী হচ্ছে ভারত এবং স্বাধীনতার প্রেক্ষিত ও যেসব রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা ভারত স্বাধীনতার সঙ্গে জড়িত ছিলেন তথা তৎকালীন বৃটিশ ভারত ও পাকিস্তানের মুসলীম লীগ ও কংগ্রেস নেতারা। আমরা কাশ্মীর; আমাদের জায়গায় কি এখনো শক্তিশালী ভূমিকা রাখছি? আজ এই প্রশ্ন আসছে, আজও ভাবছি কাশ্মীরে বিহারীদের পুনর্বাসন করলে কেমন হয়। ফয়েজের প্রশ্ন, আমার প্রতি যারা এখনো অবিশ্বস্ত তারা কি কখনো এসব কথা একবার ভেবে দেখেছেন?

প্রকৃতপক্ষে বাঙালীদের বিচ্ছিন্নতাবাদী চিন্তাধারা কেবলমাত্র ঐ '৭১ এর মধ্যে নয়। এর পশ্চাদপদ ইতিহাস বহুবছর ধরে প্রোথিত এবং বাঙালীরাই যে কেবল এই বিচ্ছিন্নতার জন্য দায়ী তাও কিন্তু নয়। যখন তারা পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চলেছে তখন তাদের আলাদাভাবে বাঙালী জাতীয়তাবাদের চিন্তাধারা শাণিত হতে থাকে এবং নিজেদের সম্পূর্নরূপে আলাদা বাঙালী জাতি হিসেবে পরিচিত করতে থাকে। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার যখন বছরের পর বছর শোষণমুলক নীতি গ্রহণ করে পূর্ব-পাকিস্তানের জন্য কম বাজেট বরাদ্দ করছে, পূর্বাঞ্চল থেকে ট্যাক্স বেশি নিচ্ছে তখন তারা মনে মনে বিদ্রোহী হয়ে উঠছে। বাঙালীরা এহেন শোষণমূলক কার্যকলাপের যথাযথ জবাব দেয়ার সুযোগের অপেক্ষায় ছিলো। সচেতনতার এই পরিস্থিতি কেবল ৬০ এর দশকে শেখ মুজিব কিংবা ৭০ এর দশকে ওয়ালী খান অথবা সাম্প্রতিক কালে জি.এম. সৈয়দ এর সৃষ্টি নয়। ১৯৫২ সালের বাংলা ভাষা আন্দোলনে বিজয়ের পর মুসলিম লীগে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালী এলিটরা প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকে। ভারত স্বাধীন হওয়ার আগে যারা ছিলেন তৎকালীন পূর্ব বাংলার প্রথম সারির মুসলিম লীগ কর্মী। এদের একজন নুরুল আমীন। যদিও তিনি অবিভক্ত পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তবুও পূব-পাকিস্তানকে প্রদেশ হিসেবে চিহ্নিত করতেন। আর তখন থেকেই একটি স্বতন্ত্র চিন্তাধারার সূচনা এবং প্রকৃত বিকাশ।

www.pathagar.com

পাট রপ্তানি করে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা কেবল পশ্চিম-পাকিস্তানে বিনিয়োগ করা হতো। কালক্রমে পূর্ব-পাকিস্তানের অপেক্ষাকৃত দরিদ্র জনগণের ভাগ্য উন্নয়নে পাটের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করা হতোনা, এই চিত্রটি বাঙালীদের কাছে বড় হয়ে দেখা দেয়। আসলে সেসময়ে পুরো পাকিস্তানের রাজনীতিকে পাট নিয়ন্ত্রিত বললেও বোধহয় ভুল হবেনা। এই সত্য যখন বাঙালীর কাছে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে কখন পূর্ব বাংলার গভর্ণর কোন বিরোধী সিদ্ধান্ত নেবে এ ছিল অসম্ভব। এই সমস্যার সমাধানে পশ্চিম-পাকিস্তান সরকার একটি জুট বোর্ড স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। এই বোর্ড সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে আয়শা জালাল বলেন, নুরুল আমীন সরকার যেন একটি বিদেশি সরকারের ক্রীড়নক হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানে কাজ করছে। এতদসত্ত্বেও এই একমুখী ধারণা প্রচলিত থাকে যে, পূর্ব পাকিস্তানের পাট রপ্তানি করে অর্জিত সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানের কাজে ব্যয়িত হচ্ছে, শোষণ করা হচ্ছে বাঙালীকে তথা পূর্ব-পাকিস্তানীদেরকে। অন্যদিকে ১৯৫৪ সালে পশ্চিম-পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠিত পাট ব্যবসায় কেন্দ্র ও জুট বোর্ড প্রতিষ্ঠার ঘটনাকে পূর্বাঞ্চলের বাঙালীরা একটি সুগভীর চক্রান্ত হিসেবে মনে করতে থাকে যার ফলাফল পাকিস্তানের অস্তিত্বের জন্য অত্যন্ত নাজুক ও ত্রিশঙ্কু অবস্থার সৃষ্টি করে। তাছাড়া হিন্দু ও মুসলমান ব্যবসায়ীদের আধিপত্যের দ্বন্দ্বও সেই অবস্থাকে আরো জটিল করে তোলে। অর্থনৈতিক প্রাধান্য বিস্তার করতে গিয়ে মাঝে মাঝে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মতো পরিস্থিতির সৃষ্টিও করেছে। এসব পরস্পর ঘটনাচক্র। অবশেষে এই নিয়ে ৫০ এর দশকের গোড়ার দিকে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধ শুরু হয়। স্নায়ু যুদ্ধে পাকিস্তানের জড়িয়ে পড়া অন্য একধরনের সমস্যার সৃষ্টি করে যা শেষ মুহূর্তে প্রায় বাংলাদেশ সৃষ্টির অনিবার্য কারণকেও প্রভাবিত করেছিল। এমনকি পূর্ব-পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হওয়ার বীজভূমি সেখানেও লুক্কায়িত ছিল বলে বর্তমান রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করেন। এ কারণে সন্দেহ এবং সন্দেহজনক অবস্থা কাটানোর জন্য, বাঙালী জনসাধারণকে শাসনের জন্য অবাঙালী শাসকদের দিয়ে পূর্ব-পাকিস্তানের শাসন পরিচালিত হচ্ছিল। এসব শাসকদের অধিকাংশই ছিলেন প্রচন্ড রকমের বাঙালী বিদ্বেষী। শাসন কাজের কোন অংশে বাঙালীর রিপোর্টে বাঙালীদের সংখ্যাগরিষ্ঠের অধিকারকে খর্ব করে রাখার প্রচেষ্টা চলছিল। তারপর নুরুল আমীনের রাষ্ট্র ভাষা সংক্রান্ত ঘোষণা - উর্দূই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। এই ঘোষণাকে বাঙালীরা পাকিস্তান প্রভুদের খলের সিদ্ধান্ত বলে মনে করে। পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম লীগের অনেকেও ঐসব সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে, তারা এই বলে মনে করেছিল উর্দূ এবং আরবী দুইই বাঙালীদের জন্য কঠিন। সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালী উর্দুর চেয়ে আরবীকে বেশী পছন্দ করতেন । ১৯৪৯ সালের বেশ, ক'টি উপ-নির্বাচনে এই বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। একারণে সেসব নির্বাচনে মুসলিম লীগের জাদরেল নেতারা শোচনীয়ভাবে পরাজয় মেনে নিতে বাধ্য হন। এরই প্রেক্ষিতে মুসলিম লীগ নীতি নির্ধারকরা কোন প্রকার আইনের

www.pathagar.com

তোয়াক্কা না করে বাকি উপ-নির্বাচনগুলোও স্থগিত করে রাখে। অবশেষে ৫টি আসনের উপ-নির্বাচন স্থগিত রাখা হলে ভাসানীর আওয়ামী মুসলিম লীগ অভাবনীয় জনপ্রিয়তা অর্জন করে। অন্যদিকে ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে বিরোধী ঐক্যমোর্চা 'যুক্তফ্রন্ট' বিপুল ভোটে জয়ী হন, কিন্তু সেই জনপ্রিয় যুক্তফ্রন্ট সরকারকেও পাকিস্তানের বুর্জোয়া শাসক চক্র নানা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে অল্প কদিনের মধ্যে বানচাল করে দেয়। সরাসরি বা প্রত্যক্ষ সরকারি শাসন কায়েম করে, যা করা হয়েছিল সেনা ছাউনির ইঙ্গিতে।

পাকিস্তান পতনের সবচেয়ে বড় অগ্রগতি হলো মুসলিম লীগের জনবিচ্ছিন্নতার সুযোগে শেখ মুজিব এর ৬ দফা কর্মসূচী। অল্প কদিনে এই ৬ দফা অভাবনীয় জনপ্রিয়তা লাভ করলো। পাকিস্তানের ২০ বছরের ইতিহাসে ৬ দফা একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ৬ দফায় যেসব দাবি অন্তর্ভূক্ত করা হয় তার মধ্যে প্রতিরক্ষা ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রের দাবিগুলো ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; পাকিস্তানের জন্য স্পর্শকাতর। ৬ দফার পক্ষে বাঙালী জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন ও আন্দোলন, সর্বোপরি পশ্চিম পাকিস্তানের নীতি নির্ধারকদের বিরোধীতার কারণে দুই অঞ্চলের স্বতন্ত্র চিন্তা আরো জোরালো হয়েছে। মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার কারণে একদিকে পূর্ব-পাকিস্তানে একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তি জোরদার হতে থাকে, অন্যদিকে সামরিক শাসন, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বৈরিতার কারণে পশ্চিমের সঙ্গে পূর্বের সম্পর্কের ক্রমাবনতি ঘটে। অতএব যারা ৭১ এর ঘটনাকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে মনে করে তারা ইতিহাস ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়া থেকে অনেক দূরে, তারা নিজেদের অজ্ঞতাকেই স্পষ্ট করবেন। সামরিক হস্তক্ষেপের ঘটনায় ব্যাপারটির তথা চাপাক্ষোভের ব্যাপারটির বিস্ফোরণ ঘটলো, অতীতের ভুল ইতিহাস বর্তমান পরিস্থিতিতে সংকট সৃষ্টি করবে। এ ধরনের সিদ্ধান্ত যদি ইতিহাসের পাতা থেকে শিক্ষা না নিয়ে পাকিস্তান সরকার অন্য কোন ব্যাপারে একই সিদ্ধান্ত নেয় তবে সেই সিদ্ধান্ত হবে হটকারিতামূলক।

সিন্ধীদের জাতীয়তাবাদী একটি পরিস্থিতিতে যদি বাঙালী তথা বাংলাদেশ সৃষ্টির মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, এ ধরনের সিদ্ধান্ত পাকিস্তানের বর্তমান নীতি নির্ধারক আর যাতে না নেয়। অবশ্য ভৌগলিক অবস্থাটি সিন্ধুর ক্ষেত্রে তুলনামূলক ভিন্নতর। তবে জাতীয়তাবাদী চেতনায় যে তীব্রতর ঘা লেগেছে তা সত্যিই চিন্তার উদ্রেক করে এবং খুবই নাজুক অবস্থায় রয়েছে। আসলে তারা জাতীয়তাবাদী চেতনায় এতো শক্তিশালী হয়েছে যে, সেখানে আইন শৃংখলাও বজায় রাখা একটি কঠিন বিষয়ে পরিণত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার যেন হিমসিম খাচ্ছে প্রতিটি ব্যাপারে। ঐতিহাসিক কারণে কাশ্মীর সমস্যার ক্ষেত্রে পাকিস্তান সরকার এখনো 'এড়িয়ে চলো' নীতি গ্রহণ করে চলেছে। আসলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের ব্যাপারটি এক ধরনের বিমূর্ততার মধ্যে পড়ে আছে। শাসকচক্র সবসময় নিজেদের

www.pathagar.com

দেশপ্রেমিক ভাবে এবং ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তান টিকিয়ে রাখার চিন্তা করে। কিন্তু পারস্পরিক কিছু ঘটনা সব অধিকারকে ব্যহত করছে। যে কারণে বিভিন্ন প্রদেশে চলছে ক্ষোভ, জাতীয়তাবাদী চিন্তা ধারার মতো স্পর্শকাতর ঘটনা। ফলে শাসন কার্যে বিভিন্ন দুর্নীতি, লুটপাট, হত্যা ও যখম ইত্যকার ঘটনাপূর্ণ এ সংকটজনক মুহূর্তে পাকিস্তানের জনগণের মাঝে দেশপ্রেম বোধকে জাগ্রত করা অত্যন্ত জরুরি। নইলে বিচ্ছিন্নতার সুযোগে অনেক দুঃখজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে। এর কারণ ইতিহাস বিকৃতি। যারা তাদের ইতিহাসকে ইচ্ছে করেই বিভাজিত করে। কিন্তু আজ সময় এসেছে জানার, এই ইতিহাস বিকৃতি কেন? এর কারণ কি? কেন ফয়েজ এর সেই কথাটি আজো সত্যি বলে প্রমাণিত। সকলের কাছে প্রশ্ন, এমন কোন শক্তি কি নেই যা পকিস্তানকে জাতিগত বিরোধ থেকে মুক্ত করতে পারে। জাতিগত বিরোধ যদি জিইয়ে রাখা হয় তবে রক্তক্ষয়ী পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। তাই আজ এ মুহূর্তে বিরোধ মেটাবে এমন শক্তির প্রয়োজন জরুরি।

দি হেরাল্ড, ডিসেম্বর ১৯৯১
আজিজ সিদ্দিকী

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ ১৯৭১: কিছু অজ্ঞাত ঘটনা

সাম্প্রতিককালে ১৯৭১ সালের ঘটনা সম্পর্কিত ডঃ আফতাব আহমেদ এর প্রবন্ধ বেশ বিতর্কের সূত্রপাত করেছে। এ ব্যাপারে আমার (ডঃ এ.বি. আজমী) মতামত ভিন্নতর। সে সময়কার একজন ছাত্রনেতা হিসেবে ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের আমি একজন প্রত্যক্ষ কর্মী ছিলাম। ১৯৫৬-৫৭ সালে পাকিস্তান সরকারের সার্জন হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে বলা চলে আইয়ুবী সামরিক শাসনের মাত্র এক বছর আগেও পাকিস্তানের দুই অংশের জনগণের মধ্যকার চিন্তাধারা ছিল একবারেই ভিন্নতর। পূর্বের লোকজন পশ্চিম-পাকিস্তানের লোকজনকে দস্তুর মতো হিংসে করতো, তেমনি পশ্চিমারাও বাঙালীদের ঘৃণা করতো। তখনও পূর্বের লোকজন রাজনীতি, অর্থনীতিসহ বিভিন্ন অধিকার সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন।

ডঃ আফতাব আহমেদ রচিত তিনটি প্রবন্ধের মতামতের সঙ্গে কোনমতেই একমত হওয়া যায়না। তিনি কেবল বলেছেন, আইয়ুবী শাসন ও তথাকথিত উন্নয়নের রাজনীতি পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালীদের মানসিক ধারণার পরিবর্তন করেছে, তা কখনো মানা যায়না। মনে পড়ে বহু আগে গোলাম মোহাম্মদ পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ ভেঙ্গে দিয়েছিলেন অথচ সেসময় পূর্ব পাকিস্তানের নেতা মৌলানা তমিজ উদ্দিন আহমেদ খান সভাপতিত্ব করছিলেন। একজন প্রধান বিচারপতি এই ঘটনা ঘটিয়েছেন। আমার ধারণা তখনই পাকিস্তানের দুই অংশের জনগণের মধ্যকার ব্যবধানের বীজ প্রোথিত হয়। যদিও ঘটনাটি পাকিস্তানের রাজনীতিতে কিছু ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়, দুই পাকিস্তানের ঐক্য দৃঢ়তর করার দাবিতে ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের সংবিধান রচিত হয়, রাজনৈতিকভাবে পাকিস্তান অন্তত একধাপ এগিয়ে আসে। কিন্তু তার আগের কিছু ঘটনা সামরিক শাসনকে পাকাপোক্ত করতে কিংবা বলা চলে সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা করে। এ সময় সংবিধান লংঘন করে সামরিক শাসন জারির মাধ্যমে ইস্কান্দার মীর্জা, আইয়ুব খান দুই অংশের দূরত্বকে আরো একধাপ এগিয়ে নিয়ে যায়।

ড: আফতাব আহম্মদ এর প্রবন্ধের জবাবে বলতে চাই, তিনি প্রধান রাজনৈতিক দলের কর্ণধার, ক্ষেত্র বিশেষে ভিলেন এবং বাংলাদেশ সৃষ্টির জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী। অবশ্য এ ক্ষেত্রে তার যুক্তিকে গুরুত্ব দেয়া চলেনা। এখানে বরং বলা চলে ভারত তার নিজের স্বার্থে শেখ মুজিবকে ব্যবহার করে, এবং যুদ্ধের সময় ভারতীয় সেনাবাহিনী দিয়েই বাংলাদেশকে স্বাধীন করে দেয়। অবশ্য তিনি স্বীকার করেন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা শেখ মুজিবের পক্ষে প্রধান শক্তি রূপে দাঁড়িয়েছিল। আগরতলা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত শেখ মুজিব, আইয়ুবের

www.pathagar.com

সঙ্গে গোল টেবিল বৈঠকে বসেছিলেন সত্যি কিন্তু পাকিস্তানের তৎকালীন নেতা বিশেষত নসরুল্লা খান, আসগর খানসহ অন্যান্যরা শেখ মুজিবের দাবিগুলোর প্রতি নজর দিতেন না। এজন্য পাকিস্তানের রাজনীতি শেখ মুজিবের কোনরকম মানসিক পরিবর্তন করতে পারেনি। গোল টেবিল বৈঠক সত্ত্বেও মুজিব তার নিজস্ব কৌশল অবলম্বন করে এগুতে থাকে। কিন্তু কোন কোন ইতিহাসবেত্তা কিংবা রাজনীতি গবেষক সে ব্যাপারটি লক্ষ করেন না। উল্লেখ্য বৈঠকের কিছু অচলাবস্থামূলক পরিস্থিতি শেখ মুজিবকে আরো কৌশলী হতে বাধ্য করেছে।

দাবি আদায়ে অটল শেখ মুজিব এক পর্যায়ে সুযোগ পেয়ে তার দাবির পক্ষে জোর তৎপরতা শুরু করেন। এই সময় তার ছয় দফা দাবি পেশ করেন। এবং এই ছয় দফার মাধ্যমে তিনি তার প্রকৃত কথা বলে দেন। ধারণা করা যায়, ছয় দফা দাবির কথাগুলোই শেখ মুজিব তথা বাঙালীর মনের সুপ্ত আকাঙ্খা। শেষ পর্যন্তও মুজিব পাকিস্তান অটুট রাখার জন্য কাজ করেননি। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের সঙ্গে বৈঠকে যান বাংলাদেশের পতাকা সম্বলিত গাড়ি নিয়ে। সেই বৈঠকে মুজিব ও তার অনুসারীরা মুজিবের পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী একটি ফেডারেশন এর পরিবর্তে কনফেডারেশনের দাবি তুলেছিল। ভুট্টো-ইয়াহিয়ার মধ্যে বিস্তর ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও মৌলিক কিছু ব্যাপারে মিল ছিল। ইয়াহিয়ার ঢাকা আসা উচিত ছিল কিনা, কিংবা জাতিসংঘে প্রস্তাব নিয়ে যাওয়া নিয়ে বিতর্ক রয়েছে সত্য, তবে পাকিস্তানের ঐক্যের ব্যাপারে দু'নেতা সজাগ ছিলেন সব সময়। ভুট্টো আগে কিছু না করে শেষ নাগাদ এসে একটি মিটিং করলেন কেন বোঝা যায়নি। তিনি হয়তো নিজের পার্টি কিংবা ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে কোন কাজ করতে অপারগতা দেখান।

১৯৭১ সালের নেপথ্য ঘটনা নিয়ে ভারত সহ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচুর মতামত প্রকাশ করা হয়েছে। পুস্তক প্রকাশ, গবেষণা হয়েছে দেদার। ডঃ আবতাফ আহম্মদ এর লেখা পড়ে মনে হয়েছে এটি যেন *war and secession*। অক্সফোর্ড এর এই গবেষণা বহু অনুসন্ধানের ফল হলেও কিছু পরিচ্ছন্ন ঘটনার বিভ্রান্তি রয়েছে। বইটিতে ভুট্টোকে একজন অসৎ, স্বার্থবাদী কিংবা বলা চলে প্রচন্ড আত্মকেন্দ্রিক গোঁয়ার প্রকৃতির হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অবশ্য ঠিক যে পাকিস্তানের ভাঙ্গনে তার একরোখা নীতি বেশ কার্যকর হয়েছিল। তিনি যে কোন মূল্যে পাকিস্তানের ক্ষমতা দখল করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু এটি ছিল দুঃসাধ্য। সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব এবং পশ্চিম পুরো বিভাজন হয়ে গেছে এবং সাংবিধানিক ভাবে সম্মিলিত পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়া তার পক্ষে কোনমতেই সম্ভব ছিলনা। এসব সত্ত্বেও ইয়াহিয়াকে জাতিসংঘে পাঠানো হয়। এবং ১৫ই ডিসেম্বর সেটি উপস্থাপন করার

www.pathagar.com

মতো বোকামীও পাকিস্তান নেতৃত্ব তখন করেছে। এখানে পাঠকের বোঝার জন্য ৩০৬ পৃষ্ঠার একটি উদ্বৃতি উল্লেখ করা প্রয়োজন। ১৯৭৯ সালে ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে দেখা যায় তখনও তিনি খসড়া উপস্থাপনের মতো অবস্থা থেকে অনেক দূরে রয়েছেন। তিনি সেই খসড়াকে পাকিস্তানের অস্তিত্বের পক্ষে ইতিবাচক বর্ণনা করে বলেন, *"Polish Resolution"* ইয়াহিয়াকে ভুট্টো কিছু শুনছেন না জানালেন। তখন তিনি বার কয়েক তা বলার পর কেবল, কি ? কি ? বলছিলেন। তখন নিউইয়র্ক এর টেলিফোন অপারেটর মাঝখানে ইয়াহিয়াকে পুরোপুরি শুনতে পাচ্ছি বলে জানালেই তিনি অপারেটরকে *shut up* বলে থামিয়ে দেন। ১৯৭৯ সালেও এই ব্যাপারটি নিয়ে ইয়াহিয়া বিমর্ষ ছিলেন।

খসড়া উপস্থাপনের ঘটনা বড় ধরনের রাজনৈতিক হৈ চৈ এর সৃষ্টি না করলেও সেনা অফিসারদের ভেতর কিছু ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করেছিল। ১৯৮৬ সালে বেনজির ভুট্টোর নির্বাচনকালে প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের বিরুদ্ধে নানান বিষোদগার করা হয়। নির্বাচনী ঘোষণায় ভুট্টোর এসব কুকীর্তির বর্ণনা করা হলে বেনজীর পিতার ন্যায় কাজ করবেন না বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ থেকে ওয়াক আউটকে তিনি বা জনগণ কোনভাবে নেবেন তা বোঝা যায়নি। এভাবেই মূলতঃ মুজিব তার বাংলাদেশ ছিনিয়ে নিলেন এবং ভুট্টো ভাঙ্গা পাকিস্তানের সরকার প্রধান ও সামরিক শাসক হলেন। একটি অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটলো।

দি নিউজ, জুলাই ২, ১৯৯২
ড: এম.বি. আজমী।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ: ইতিহাস যেভাবে এগিয়েছে

সাম্প্রতিক এশিয়ায় পূব-পাকিস্তান তথা ঢাকার পতন সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। পাকিস্তানের বড় ট্রাজেডী। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের আলাদা হবার ঘটনা কোনক্রমে এক দিনের নয়। এই ঘটনার বীজ অনেক গভীরে প্রোথিত। স্বাধীনতাত্তোর সদ্য স্বাধীন পাকিস্তানের পূর্বের অংশ নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছে, এজন্য পশ্চিমা নেতারাও বেশ শংকিত ছিলেন। দুই অংশে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার পর পূর্ব এবং পশ্চিম কেবল সাংবিধানিক সংকটই সৃষ্টি করেনি, সামাজিক, অর্থনৈতিক এমনকি প্রশাসনিক সংকটও সৃষ্টি করেছে।

দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে সৃষ্ট বর্তমানের ভারত আর পাকিস্তান। ভারতীয় হিন্দু-মুসলমান একান্তই নিজেদের স্বার্থেই পাকিস্তান চেয়েছে। এই উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান সৃষ্টি ছিল তাদের দীর্ঘ দিনের সংগ্রামের ফসল কিংবা এক ধরনের আল্লাহর দান বলা চলে। অপরদিকে ভারতীয় হিন্দুদের জন্য এটি ছিল ইতিহাসের অমোঘ পরিণতি। যার জন্য তারা পূর্ব থেকেই মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিল। এজন্য ভারতীয় হিন্দুরা যে কম ব্যথা পেয়েছে তা বলা যাবেনা। তাদের ধারণায় পাকিস্তান সৃষ্টিতে বৃহৎ ভারত মাতা পঙ্গু হলো।

স্বাধীনতার পরপরই পূর্ব ও পশ্চিমের অবস্থান নিয়ে মূল পাকিস্তান বড় ধরনের সংকটে পতিত হয়। এই দুই অংশের ব্যবধান ছিল ১০০০ মাইলেরও বেশি, তার ওপর মাঝে ভারতের মতো শত্রুর থাবা। ভারত ইচ্ছে করলে যে কোন সময় দুই অংশের মধ্যকার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারতো, যুদ্ধের সময়তো করেছেই। সংকট আসলে ওখানেই নিহিত ছিল। পূর্ব- পাকিস্তানের বাঙালী রাজনীতিবিদগণও এসব ব্যাপারে বেশ সচেতন ছিলেন। তদুপরি দুই পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতারা ছিলেন ভিন্ন চিন্তায় বিশ্বাসী, তাদের চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় পশ্চিমা রাজনীতিবিদগণের সিংহভাগই ছিলেন ভূ-স্বামী, পূর্বের রাজনীতিবিদগণ ছিলেন শ্রেণী সচেতন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী। পূর্ব-পশ্চিমের সবচেয়ে বিপজ্জনক বিষয় ছিল দু'অঞ্চলের দু'টি ভাষা। ভাষাগত বৈষম্য ও বিভেদ এর বীজ গোড়ার দিকে বিশেষত ৪৮ সাল থেকেই শুরু হয়। সে সময় বাঙালী এক গণপরিষদ প্রতিনিধি হাউসে বাংলা ভাষার মর্যাদা নিয়ে প্রশ্ন তুললে একটু বিতর্কের সৃষ্টি হয়। তাঁর দাবি ছিল বাংলা ভাষাকে অফিসিয়ালী দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দান করা। তৎকালীন যুক্ত পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খান দাবিটি পুরোপুরি অস্বীকার করেন। অপরদিকে বাঙালীরা তাদের ভাষার ওপর অন্য ভাষার শ্রেষ্ঠত্বকে মেনে নিতে পারেনি। মূলতঃ এখান থেকেই সংকটের শুরু হয়। ভাষার ঘটনাটি ক্রমেই রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপ পরিগ্রহ করে। এর মধ্যে কিছু পূর্ব-পাকিস্তানের হতাশ

www.pathagar.com

হয়ে যাওয়া রাজনীতিবিদ মুসলিম লীগ এর কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। ছাত্ররা ছাত্রলীগ নামে একটি ছাত্র সংগঠন গড়ে তোলে এবং ভাষার পক্ষে ব্যাপক জনমত গঠন করে।

১৯৪৮ সালের ১৯শে মার্চ কায়েদ-এ-আজম ঢাকার এক বিশাল জনসভায় বলেন; উর্দু হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। তিনি বক্তৃতায় শ্রোতাদের সতর্ক করে দিয়ে বলেন, "শত্রুরা পাকিস্তানের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। আঞ্চলিকতার ধুয়া তুলে স্বার্থবাদীরা কাজটি হাসিল করার চেষ্টা করছে। এই স্বার্থবাদীদের হাত থেকে নিজেরা দূরে না থাকলে পাকিস্তানীদের রেহাই নেই"। কায়েদ-এ-আজম এর এই বক্তৃতা সত্ত্বেও ব্যাপারটির কোনরকম ইতিবাচক সমাধান সম্ভব হয়নি। ১৯৫২ সালের দিকে পাকিস্তান সরকার আরবী হরফে বাংলা লেখা শুরু করলে পূর্ব-পাকিস্তানে তা ব্যাপক অসন্তোষের জন্ম দেয়। এ সময়ই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন এক জনসভায় বলেন; উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। এ নিয়ে ঢাকায় বিরাট হাঙ্গামা। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র নিহত হলে সবাই জিন্নাহকে গালাগাল দিতে থাকেন। চাপের মুখে আঞ্চলিক পরিষদ বাংলাকে একটি জাতীয় ভাষা হিসেবে মর্যাদা দিতে বাধ্য হয়। ১৯৫৪ সালে গণপরিষদে বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকার করে নেয় তখন এই আন্দোলন বন্ধ হয়।

পাকিস্তানের দ্বিতীয় সমস্যাটি ছিল সংবিধান প্রণয়নের ব্যাপারে বিশেষত আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন কিংবা প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন- এই দুই বিকল্পের কোনটি গ্রহণ করা দরকার, এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। পাকিস্তানী রাজনীতিতে এই প্রাদেশিকতাবাদ মারাত্মকভাবে প্রভাব ফেলে। ১৯৫২ সালের ডিসেম্বরে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে গণপরিষদের সিট নির্ধারণের জন্য একটি খসড়া প্রস্তাব প্রণয়ন করেন। কিন্তু পাঞ্জাবীরা এই প্রস্তাবে বাধ সাধে, তাদের যুক্তি হলো এতে বাঙালীরা গণপরিষদে প্রাধান্য পেয়ে যাবে। সমসাময়িক কালে বগুড়ার মোহাম্মদ আলীও সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সদস্য সিটের প্রস্তাব করেন যা উচ্চ ও নিম্ন দুই পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতার নিরিখে সিট নির্ধারণের কথা বলে দেয়। একই সঙ্গে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের দ্রুত শিল্পায়ন নীতি কিংবা পশ্চিম-পাকিস্তানে উন্নয়ন নীতি পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে ব্যাপক দূরত্বের সৃষ্টি করে। এখানে পশ্চিমের প্রতি তার নজর অপেক্ষাকৃত অধিক হওয়ায় পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙালীরা বৈষম্যের ধুয়া তোলে। অবশ্য সেসময় আইয়ুব খানের অর্থনীতির নীতি এতোই ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে যে, পুরো দেশের অর্থনীতি মাত্র ২২টি পরিবার এর অধীনে চলে যায়। এই অভিযোগ প্রায় সকল বাঙালীর। পূর্ব-পাকিস্তানে এসময় দ্রুতহারে জনসংখ্যা ও বেকারত্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে, মার্কিন সাহায্য এ অঞ্চলে ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি করেছে। এসময় বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণী পূর্ব-পশ্চিম বৈষম্য

www.pathagar.com

সম্পর্কে ব্যাপক মতামত প্রকাশ করে এবং জনগণকে জানিয়ে দেন। তাদের অভিমত, পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্বশাসনাধিকার নিশ্চিত না করলে কোনমতেই এখানকার অর্থনৈতিক অবকাঠামোর উন্নয়ন সম্ভব নয় এবং এটি জোরালো জনসমর্থন পায়।

বাঙালীর অভিযোগ ছিল পূর্ব-পাকিস্তানের প্রায় সকল সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাই পশ্চিম-পাকিস্তানী; দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নীতি নির্ধারণের সকল উচ্চপদগুলো ছিল উর্দু ভাষী পাঞ্জাবীদের দখলে। পাকিস্তান সরকারের এহেন নীতি পুরো বাঙালীকে পাকিস্তান চিন্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। এ কারণে তারা পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। এসময় দূরত্ব কমানোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কিংবা মুসলিম লীগের নেতারা কোন ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। এমনকি বাঙালীদের এই ন্যায্য দাবির প্রতি নেতারা কোন ভ্রূক্ষেপ করেননি। সরকারী আমলারাও এর জন্য কম দায়ী নয়। কারণ তারা কখনো পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতেন না। বাঙালীর অন্যতম আর এক অভিযোগ সামরিক বাহিনীতে পশ্চিম-পাকিস্তানীদের নেয়া, বাঙালীদের এক ধরনের ভ্রান্ত ধারণার কারণে নেয়া হতোনা। বৃটিশ আমলের ধারণা-বাঙালীরা যোদ্ধা জাতি নয়, এটি স্বাধীন পাকিস্তানী রাজনীতিবিদরাও মনে করতেন। এসব কারণে পূর্ব-পাকিস্তানে পশ্চিমা সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তারাই মূলতঃ দায়ী; কারণ তাদের অঙ্গুলী নির্দেশ পাকিস্তান শাসন করতো।

স্বাধীনতার পরপরই হয়তো ঘটনাগুলো এতো বড়ো হতো না, বিশেষত যথাযথ গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হওয়ায় সামরিক শাসকগণ ক্ষমতা দখলের প্রয়াস পায়। এতে বাঙালীরা বৃটিশ উপনিবেশ শাসনের অধীনের পরিবর্তে পাকিস্তানীদের অধীনস্থ হলো। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাঙালীদের অনুপস্থিতি ক্রমশ তাদের পশ্চিমা বিরোধী করে তোলে। এসময় ১৯৫৮ সালে জেনারেল মোঃ আইয়ুব খান জোর করে সামরিক আইন জারী করে। শাসন ক্ষমতা দখলের সময় তিনি রাজনীতিবিদদের গনতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক ব্যর্থতার জন্য দায়ী করেছিল। এসময় রাজনীতির সুষ্ঠু ধারা অগ্রগতির পথে কিছু বাঙালী ও পাঞ্জাবী নেতার গোয়ার্তুমির জন্য মার খেয়েছে, একথা ভুলে যাবার নয়। যদিও আইয়ুবের শিল্প উন্নয়ন নীতি পূর্ব পাকিস্তানের শক্ত অর্থনৈতিক ভিত গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল তথাপি সাধারণ মানুষের ভাগ্যের উন্নয়নে ব্যর্থ হওয়ায় তা মার খেয়েছে। আইয়ুব সরকারের নীতি দরিদ্রতা, অজ্ঞতা, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সহ বিভিন্ন বিষয়ে কোনরকম ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেনি।

১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ বাঙালীদের নিরাপত্তাকে শংকিত করে তোলে। এসময় পূর্ব-পাকিস্তান মূল পাকিস্তানের কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং

www.pathagar.com

নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে থাকে। সে সময় পাকিস্তানের এক ডিভিশন সেনাবাহিনীকে পূর্ব-পাকিস্তান রক্ষার্থে পাঠানো হয়েছিল। এই আর্মি ভারতের শক্তিশালী সেনাবাহিনীর কাছে ছিল নিতান্তই অপ্রতুল। এসময় তৎকালীন পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জেড. এ. ভুট্টো গণপরিষদের এক বক্তৃতায় বলেন, 'বাংলা চীন দ্বারা নিরাপদ' এই বক্তৃতা বাঙালীর মনে চূড়ান্ত অসন্তোষের জন্ম দেয়। সারা পাকিস্তানে বিতর্কের ঝড় ওঠে। চীনের সহযোগিতা পাওয়া না গেলে পশ্চিম-পাকিস্তান নিরাপদ থাকলেও পূব-পাকিস্তান কখনোই নিরাপদ থাকতে পারে না। এ সত্ত্বেও 'তাসখন্দ চুক্তি'র সময় পুরো পাকিস্তানে ব্যাপক ধড়পাকড় শুরু হয়, কোন কোন স্থানে গুলি করে নাগরিকদের হত্যা করা হয়। পূর্বে কোন রকম বড় ধরনের হাঙ্গামা না হলেও এই ঘটনা বাঙালী নেতৃত্বের জন্য বিরাট সৌভাগ্য বয়ে নিয়ে আসে।

১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মুজিবর রহমান সেই সুযোগ হাত ছাড়া করলেন না। তিনি তার 'ছয়দফা' পেশ করলেন। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলোর ব্যাপক প্রচারে মুজিবর রহমান 'হিরো'তে পরিণত হয়। অন্যদিকে আইয়ুব খান 'ছয়দফা'কে তার উন্নয়ন নীতির বিরুদ্ধে বড় অভিযান রূপে দেখে উড়িয়ে দেন, সমস্যার গভীরে তিনি যাননি। তিনি মনে করেন, এটি তার স্বায়ত্ত্বশাসনের বিরুদ্ধে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ। উল্লেখ্য, এ সময় ভারত বাংলার এই আন্দোলনে পরোক্ষভাবে সহায়তা করে। কিন্তু ১৯৬৩ সালের মে মাসে মুজিব গ্রেফতার হলে আওয়ামী লীগ কর্মীরা ৬ দফার পক্ষে ব্যাপক প্রচার অব্যাহত রাখে। ৭ই জুন হরতাল পালিত হয়। এ সময় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটে। অভিযোগ ওঠে সীমান্তের ওপার থেকে হিন্দুরা এসে আওয়ামী লীগকে সহায়তা করছে। ১৯৬৮ সালের জানুয়ারী মাসে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয়। বিচারপতি এস.এ. রহমান এর নেতৃত্বে তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়। মামলায় নৌবাহিনী, সিএমসি অফিসার, প্রথম সারির আওয়ামী নেতাসহ মোট ৩৫ জনকে দায়ী করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানে এসময় *open trial* এর দাবি ওঠে কিন্তু আইয়ুব খান তা করেননি, এটি ছিল তার বড় ভুল। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন এর মাধ্যমে অন্তত আন্দোলন থামিয়ে দেয়া যেতো, কিন্তু এমন ভুল করেছেন যে, পুরো মামলাই তার বিপক্ষে চলে গেছে। মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে এই মামলায় তিনি অনেক সুযোগ হারিয়েছেন, মুজিবের প্রতি কোন অজ্ঞাত দরদে তিনি তা করেননি বলা মুশকিল। ফলে ষড়যন্ত্র প্রমাণে ব্যর্থ হয়ে নিজে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। পাকিস্তানী রাষ্ট্র বিশ্লেষকদের মতে, মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে মামলায় জিততে পারলে মুজিব হতেন পাকিস্তানের মৃত নেতা।

www.pathagar.com

১৯৬৮ সালের শেষের দিকে নিরপেক্ষ পার্লামেন্ট নির্বাচনের দাবিতে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন তীব্রতর হয়। পশ্চিমী নেতা জেড. এ. ভুট্টো এই দাবি উত্থাপন করলেও পক্ষে নামেন পূর্বের নেতা আব্দুল হামিদ ভাসানী। দেশব্যাপী হরতাল পুরো রাজনৈতিক কাঠামোকে স্থবির করে দেয়। এ সময় আইয়ুব কোন পথ খুঁজে পেলেন না, তিনি অতপর ১৯৬৯ সালের ২৫ শে মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। ইয়াহিয়া ক্ষমতায় গিয়ে ১৯৬২ সালের সংবিধান বাতিল ঘোষণা করেন। এই সময় রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে এক বৈঠকে শীঘ্রই সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার প্রতিশ্রুতি দেন।

১৯৭০ সালের ১লা জানুয়ারী রাজনৈতিক কার্যকলাপের ওপর জারীকৃত সকল নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হয়। এ সুযোগে পূর্ব-পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ এবং পশ্চিম-পাকিস্তানে পিপলস পার্টি (পিপিপি) ব্যাপক জনসংযোগ কার্যক্রম শুরু করে। এ বছর অক্টোবরে সাধারণ নির্বাচনের কথা থাকলেও এসময় পূর্ব পাকিস্তানে প্রলয়ঙ্করী ঘুর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস এর কারণে ডিসেম্বর পর্যন্ত নির্বাচন স্থগিত করা হয়। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্বে এবং পিপিপি পশ্চিম-পাকিস্তানে বিপুলভাবে জয় লাভ করে। রাজনৈতিক এই খেলায় ভুট্টোর বিজয়ের পেছনে পাকিস্তান আর্মির হাত ছিল বলে অনেকেই অভিযোগ করেন। ভূট্টো পশ্চিমে কেন্দ্রীয় প্রশাসনে কোয়ালিশন সরকার গঠনের প্রস্তাব দেয়, ভুট্টোর পরামর্শ মতো ইয়াহিয়া ও মুজিবর রহমানকে পিপিপি'র সঙ্গে সমঝোতায় পৌছানোর আহবান জানান। পূর্বে উপসাগরীয় বৈঠকে মুজিব-ভুট্টো এ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করেছিলেন।

১৯৭১ সালের ২৭শে জানুয়ারি ভুট্টো তার প্রস্তাব নিয়ে ঢাকায় মুজিবর রহমানের সঙ্গে দেখা করতে যান। কিন্তু ছয়দফা'র ব্যাপারে কোনরকম আপোষ রফা না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত এই আলোচনা ব্যর্থ হয়। আওয়ামী নেতৃত্ব 'ছয়দফা'র পূর্ণ বাস্তবায়ন চায় অপরদিকে পিপিপি এ ব্যাপারে কোনরকম ছাড় দিতে নারাজ। এরই প্রেক্ষিতে আলোচনা ব্যর্থ হয়, বৈঠক ভেঙ্গে যায়। রাওয়ালপিন্ডিতে ফিরে এসে ভুট্টো আলোচনার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে পরামর্শ করে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবান করার অনুরোধ জানান। এ সময় হাজার হাজার ভারতীয় নাগরিক বাংলায় প্রবেশ করে সারা পূর্ব-পাকিস্তানে অরাজকতা সৃষ্টি করে। একই সময় ভারত তার আকাশসীমা দিয়ে সকল প্রকার পাকিস্তানী বিমান চলাচল নিষিদ্ধ করে দেয়। ফলে দুই অংশের মধ্যে কোনরকম যোগাযোগের সুযোগ থাকেনা। ভুট্টো-ইয়াহিয়া বৈঠক করে মার্চের ৩ তারিখ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবান করেন। এ সময় আওয়ামী লীগ এর জাতীয় পরিষদ ও নির্বাচিত এমপিদের এক যৌথ বৈঠকে 'ছয়দফা'র ব্যাপারে কোন রকম আপোষ না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মুজিবর রহমান সরাসরি 'ছয়দফা'র ব্যাপারে কোন রকম আপোষ করা

www.pathagar.com

তার পক্ষে সম্ভব নয় বলে জানিয়ে দেন। অপরদিকে ১লা মার্চ হঠাৎ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করা হয়। শেখ মুজিব এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ২রা মার্চ হরতাল আহবান করেন। এই হরতালের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীরা অবাঙালী ও বিহারীদের ঘরবাড়ী লুট পাট শুরু করে। ৪ঠা মার্চ মুজিবর রহমান অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন এবং ৫ই মার্চ প্রেসিডেন্ট তাকে এক আলোচনার প্রস্তাব পাঠান।

১০ই মার্চ এক টেলিগ্রাম বার্তায় ভুট্টো পাকিস্তানকে রক্ষা করার জন্য মুজিবর রহমানকে অনুরোধ জানান এবং সমস্যার সমাধানে শিগগীরই ঢাকা আসবেন বলে জানান। কিন্তু ততক্ষণে বড্ড দেরি হয়ে গেছে। সংকট ইতিমধ্যে বেশ ঘনীভূত হয়েছে। ২৩শে মার্চ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে সারা বাংলায় 'প্রতিরোধ দিবস' পালিত হয়। শেখ মুজিবের বাড়ীতে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলিত হয়, তিনি এর অভিবাদন গ্রহণ করেন। পতাকা উত্তোলনের সময় তিনি বলেন, 'আজ থেকে নতুন একটি দেশের অভ্যুদয় ঘটলো'। ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। পশ্চিম-পাকিস্তান নেতৃত্ব এরই পরিপ্রেক্ষিতে ২৬শে মার্চ থেকে সামরিক অভিযান পরিচালনা শুরু করে। সামরিক কর্তৃপক্ষ সারা দেশে সমস্ত রকম রাজনৈতিক কর্মকান্ড বন্ধ করে দেয়। ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবকে দেশদ্রোহী রূপে আখ্যায়িত করেন। সামরিক অভিযানের সময় ব্যাপক বেসামরিক জনগণকে হত্যা করা হয়। মূলতঃ সামরিক অভিযানের এই ঘটনা পাকিস্তানের ভাঙ্গনকে আরও এগিয়ে নেয়।

রাজনৈতিক নেতারা এসময় প্রমাদ গুণলেন এবং মনে করলেন সামরিক শাসন আর কোন দিনই দুই পাকিস্তানকে এক করে ধরে রাখতে পারবেনা। সেসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সামরিক অভিযানের বর্ণনা করতে গিয়ে এক বৃটিশ সাংবাদিক বলেন, 'তখন প্রায় সন্ধ্যা ৫টা, ৪০০ পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর একটি দল হল প্রাঙ্গনে প্রবেশ করে অমানবিক ভাবে ছাত্রীদের কাপড় চোপড় টেনে হিছড়ে খুলে ফেলে। বীভৎস আর্তচিৎকার শোনা যাচ্ছে চর্তুদিকে, শাড়ী, সালোয়ার, কামিজ খুলে ফেলে দেয় এদিক সেদিক। এভাবে প্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য বাঙালীরা নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছে, বিজয় ছিনিয়ে নেয়ার শপথ করেছে'।

পরে জেনারেল নিয়াজীকে সামরিক প্রধানের দায়িত্ব দেয়া হলে দায়িত্ব গ্রহণকালে তিনি বলেন, পূর্ব-পাকিস্তান এখন শত্রুভূমি। বার্মার মতো যাচ্ছেতাই সেখানে করতে পারো। বাঙালী সামরিক বাহিনী সদস্য, ইপিআর ও পুলিশ এদের 'জারজ' বলে অভিহিত করে তিনি বলেন, "সামরিক, বেসামরিক সকল বাঙালী হিন্দু, মুসলমান এখন আমাদের শত্রু।" এভাবে পাকিস্তান টিকিয়ে রাখার জন্য সে সময়কার পাকিস্তানী নেতারা সমস্ত রকম পন্থা

www.pathagar.com

অবলম্বন করে। এক সময়কার পররাষ্ট্রমন্ত্রী লেঃ জেঃ সাহেবজাদা ইয়াকুব আলী খান এসময় পূর্বের সামরিক বাহিনীর প্রধান হয়ে সামরিক অভিযান চালিয়ে যাবার নির্দেশ দিলেন দৃঢ়ভাবে। কিন্তু সামরিক অভিযান ইতিবাচক কোন সমাধান দিতে পারেনি।

ইতোমধ্যে ভারত সরকার মুজিবর রহমানকে গ্রেফতারের তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। সামরিক হস্তক্ষেপের সময় ভারতের যোগাযোগের কথা প্রমাণিত হলো। প্রকাশ্যেই ভারতীয় সৈন্যরা সাদা পোষাকে পূর্ব পাকিস্তানে ঢুকে পড়ে, বিদেশি পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে স্বাধীনতা যুদ্ধের কথা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হতে লাগলো। মার্চ-এপ্রিলে ব্যাপক সংখ্যক আওয়ামী নেতা কর্মী সাধারণ জনগণ সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে পৌছায়। পাকিস্তান উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধানের জন্য ভারতকে অনুরোধ জানানো সত্ত্বেও ভারত সেদিন এব্যাপারে কোন আগ্রহ দেখায়নি। সে বছর মে মাসের দিকে মুক্তিবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশ করে রাস্তা-ঘাটের ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালালো, পেছনে ছিল ভারতের শক্তিশালী হাত। পুরো এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারতীয় সামরিক বাহিনী মুক্তিবাহিনীকে পাকিস্তানী সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য অস্ত্র দিয়ে সহায়তা করে। ৩রা সেপ্টেম্বর ডঃ এস, মালিক ও জেনারেল নিয়াজিকে যথাক্রমে গভর্নর ও সামরিক প্রশাসক হিসেবে পূর্ববঙ্গে পাঠানো হলো। তিনি সকলকে ক্ষমাসহ আত্মসমর্পণ করার আহবান জানান। নভেম্বরের দিকে বোঝা গেল সমস্ত পাকিস্তানের অস্তিত্ব এই মুহূর্তে হুমকির সম্মুখীন। এ সময় ভারত পাকিস্তান আক্রমণ করে বসে। ১০শে ডিসেম্বর ডঃ মালিক প্রেসিডেন্টকে রাজনৈতিক সমাধানের অনুরোধ জানিয়ে যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব পাঠান। তখন প্রেসিডেন্ট অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেয়ার অনুরোধ জানান। ১৫ই ডিসেম্বর ভারতীয় বাহিনী ঢাকার কাছে পৌছে এবং ১৬ই ডিসেম্বর জেনারেল নিয়াজী জেনারেল জগজিৎ সিং আরোরার কাছে আত্মসমর্পণ করে পাকিস্তান পতনের দলিলে স্বাক্ষর করেন।

দি পাকিস্তান টাইমস, ২০শ ডিসেম্বর ১৯৯২
মালিক জাহিদ হোসেন।

www.pathagar.com

তারা ইতিহাস বিকৃত করে ইতিহাসের পাতা থেকে বঙ্গবন্ধুকে মুছে ফেলতে চায়।

- শেখ হাসিনা ওয়াজেদ
সভানেত্রী, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

প্রশ্ন: স্বাধীনতার ২০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী গতকাল ১৬ই ডিসেম্বর পেরিয়ে গেল। আপনি কি মনে করেন জনগণ স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় যা চেয়েছিল তা আজ পেয়েছে?

উত্তর: স্বাধীনতার মূল উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক ও শোষণমুক্ত একটি বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা। কিন্তু দূর্ভাগ্যক্রমেই হোক আর সৌভাগ্যজনক কারণেই হোক আমরা স্বাধীনতাত্তোর সেই লক্ষ্য অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছি, কিংবা বলা যায় সেই প্রত্যশা পূরণে ব্যর্থ হয়েছি। তার অন্যতম কারণ স্বাধীনতার মাত্র কয়েক বছর পরই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে হত্যা করা হয়েছে। ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা সরকারকে। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর থেকে সামরিক শাসকরা ক্ষমতা দখল করে রাখে। ফলে দেশটি তখন থেকেই কখনো প্রত্যক্ষ আবার কখনো পরোক্ষভাবে সামরিক শাসনের কবলে থেকে যায়। আপনারা (সাংবাদিক) দেশে যেভাবে সামরিক শাসন চলছে তা আন্দাজ করলে বুঝতে পারবেন। একথা সত্যি যে, বাংলাদেশ কেন, পৃথিবীর কোন দেশেই সামরিক শাসন জনগণের কল্যাণ তোয়াক্কা করে না। আর তাই বিগত প্রায় ১৫ বছর সামরিক শাসনের অধীনে থেকে বাংলাদেশ তার শক্ত অর্থনৈতিক বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। সামাজিক, রাজনৈতিক নানা অশান্তিতে আমরা আজ তটস্থ। আমরা জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর থেকেই সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার সেই প্রেরণা হারিয়েছি।

প্রশ্ন: স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় আপনার পরিবারের ভূমিকা অবিস্মরণীয়-যা বিশ্বে বেশ প্রশংসনীয়। কিন্তু সেই পরিবার তথা বাংলাদেশের রাষ্ট্রের জনককে এভাবে নির্মম হত্যার কারণকে আপনি কিভাবে দেখেন এবং এটি কারা করেছে।

উত্তর: বাংলাদেশ স্বাধীন করে বাঙালী জনগণকে নিয়ে একটি শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা ছিলো বঙ্গবন্ধুর আজীবন লালিত স্বপ্ন। আর সেই প্রেরণা বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে। ভাত, কাপড়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং চাকুরির নিশ্চয়তার দাবিতে বঙ্গবন্ধু আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। আজ পরিস্কার হয়ে গেছে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে সেসব স্বপ্ন ধুলিস্যাৎ

www.pathagar.com

করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু ঐ সময় তার ইপ্সিত লক্ষ্য পূরণে সক্ষম হয়েছিলেন। তারপর থেকে যেসব সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন তারা জনগণ দ্বারা গৃহীত হননি। প্রত্যাখ্যাত হয়েছে সব সময়। ফলে ক্ষমতাচ্যুতির পরই তাদের সকল কর্ম-অপকর্মের ধারায় লুপ্ত হয়েছে। ধরা পড়েছে ক্ষমতায় থাকাকালীন নানান অপকর্ম। তারা ক্ষমতার অপব্যবহার করে দিনের পর দিন সম্পদের পাহাড় গড়েছে। তেমনি গরীবদের শোষণ করে দিনের পর দিন আরো গরীব করেছে, করেছে সহায়-সম্বলহীন। বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে ৫০ শতাংশ লোক দারিদ্র সীমার নীচে বাস করতেন আজ সেই হার দাঁড়িয়েছে ৮৬ শতাংশে। একই ভাবে ৭৫ পূর্ব ভূমিহীনদের সংখ্যা ছিল শতকরা ৩৭ ভাগ আর বর্তমানে হয়েছে ৭০ ভাগ।

প্রশ্ন: আপনি আপনার উত্তরে শেখ মুজিবর রহমান তথা আপনার পিতাকে 'জাতির পিতা' বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু জাতীয়ভাবে আজও বঙ্গবন্ধুকে জাতির পিতার আসনে অধিষ্ঠিত করা হয়নি কিংবা করতে পারেননি, তার কারণ কি?

উত্তর: হ্যাঁ, তা সত্যি, আমাদের সংবিধানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তথা আমার পিতাকে জাতির জনক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু আপনি জানেন যারা তাঁর নৃশংস হত্যাকান্ডের পর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে তারা তাঁর নাম বাংলাদেশের ইতিহাস থেকে মুছে ফেলতে চেয়েছে। এমনকি স্বাধীনতার ইতিহাসকে বিকৃত করার চরম ধৃষ্টতা দেখিয়েছে। বাঙালীর জন্য এই বিকৃতি নিঃসন্দেহে দুঃখজনক। তারা কেন ইতিহাস বিকৃতির অপচেষ্টায় লিপ্ত তা আমি জানিনা। হয়তো (হেসে বললেন) তাদের পুরনো প্রভু পাকিস্তানীদের সন্তুষ্ট করে তাদের সমীহ কিংবা বাহবা পাবার জন্য।

প্রশ্ন: সম্প্রতি অবাধ ও সুষ্ঠু একটি নির্বাচনের মাধ্যমে বিএনপি'র ক্ষমতারোহন বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সূচনা করেছে বলে বিশ্লেষকরা মনে করছেন, এব্যাপারে আপনার অভিমত কি?

উত্তর: অবশ্য প্রথম ৬ মাসের ঘটনা সত্য, তবে বর্তমান সরকারের কর্মতৎপরতার প্রতি আমরা সন্তুষ্ট নই। তবে আমরা এখনো আশাবাদী। আপনি হয়তো লক্ষ্য করছেন কিছু সাংবিধানিক পরিবর্তন ইতোমধ্যেই সংঘঠিত হয়েছে। যার অন্যতম হলো সংসদীয় সরকারের প্রতিষ্ঠা। আমরা জনগণের কাছে প্রতিশ্রুতবদ্ধ ছিলাম। আমরা অবশ্যই জাতীয় উন্নয়নে সকলকে সহযোগিতা করতে রাজী। বিএনপিকে তো অবশ্যই। গণতন্ত্র টিকিয়ে রাখতে হলে সহযোগিতার হাত তো প্রশস্ত করতে হবে।

www.pathagar.com

প্রশ: এই অভিযোগ প্রায়ই করা হয় যে, আওয়ামী লীগ ভারতের প্রতি দুর্বল অর্থাৎ অনেকটা ভারত ঘেঁষা। অপরদিকে বিএনপি একদিকে প্রচন্ডভাবে ভারত বিরোধী এবং ইসলামী কার্ডধারী এবং জনগণকে তাদের সেই পরিচয়েই ভোট দিতে উৎসাহিত করেছে। এ ব্যপারে আপনার অভিমত কি?

উত্তর: পাকিস্তান আমলের শেষ তথা '৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে আপনার দেশের নেতারা যে ধরনের অপপ্রচার চালিয়েছিল ক্ষমতাসীন বিএনপি দলও নির্বাচনকালে সে ধরনের অপপ্রচার করেছে। দুর্নীতি, মিথ্যাচার আর ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিয়েছে। আপনি জানেন পাকিস্তান ও বাংলাদেশ উভয়কালে সামরিক গোয়েন্দা বিভাগকে গত ১৫ বছর ধরে সবসময় আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছে। বিএনপি নেতারা গত ১৫ বছর ধরে সবসময় আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করে ক্ষমতার অপব্যবহার আর লুটপাট করেছে। ফলে আজকের এই নির্বাচনে কালো টাকার ছড়াছড়ি লক্ষ্য করা গেছে। কালো টাকার জোরেই তারা জনগণকে প্রতারিত করেছে, ভোটে জিতেছে।

প্রশ্ন: সাম্প্রতিক কালে আপনি সংসদে 'ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল করণ বিল' আনতে চেয়েছেন এবং আপনার দল বঙ্গবন্ধুসহ তার পরিবারের অন্যান্যদের হত্যার বিচারের সেই বিল সমর্থন করেছে। আপনি কি মনে করেন বর্তমান ক্ষমতাসীন বিএনপি বা তাদের নেতারা সেই বিল পাশ করে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার কার্যকরী করার পথ সুগম করবে? যদি তা পাশ হয় তবে আপনি আপনার পিতা ও পরিবার হত্যকারীদেরকে কোর্টে তুলবেন?

উত্তর: তিন জোটের রূপরেখায় বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের পথ রুদ্ধ করা আইনসহ যে সকল গণবিরোধী আইন আছে তা বাতিল করার অঙ্গীকার ছিলো। সেখানে ষড়যন্ত্র, হত্যা, ক্যু'র রাজনীতি চিরতরে বন্ধ করে দেয়ার সুপারিশ করা হয়েছিল। যদি বিএনপি সরকার এখন তা না করে তাহলে কেন করছেনা বা করবেনা তা আপনি নিশ্চয় বোঝেন। এই আইনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু তথা জাতির পিতার হত্যাকারীদের বিচারের পথ রুদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু দেশের প্রচলিত আইনে যে কোন খুন শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং খুনের জন্য তাকে শাস্তি দেয়া হয়। একই দেশে একই সঙ্গে দু'ধরনের আইন প্রচলিত থাকতে পারে না মন্তব্য করে তিনি বলেন, এর একটি হলো খুনীকে আইন করে ক্ষমা করা এবং অন্যটি হলো যথাযোগ্য শাস্তি প্রদান। যদি আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হয় তবে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল করা জরুরী। নইলে গণতন্ত্র থাকবেনা বিএনপি সরকারও তা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিল। যদি ইনডেমনিটি বিল বাতিল না হয় তবে তার পরিণতি সময়ের প্রেক্ষিতে বলা সম্ভব হবে।

www.pathagar.com

প্রশ্ন: বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে বিরাজমান দুরত্বকে নতুন গণতন্ত্রের অভিযাত্রার প্রেক্ষিতে আরো বন্ধত্বসুলভ করা যায় কিনা তা সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

উত্তর: যদিও স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানের বিভাজন হয়েছে, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ। কিন্তু স্বাধীনতার পরপরই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা ছিল আমাদের পররাষ্ট্র নীতি "সকলের সাথে বন্ধুত্ব কারো সাথে শত্রুতা নয়।" এখানে আমি কিছু মন্তব্য করতে চাই। পাকিস্তানী নাগরিকদের অনেকেই আজ বাংলাদেশে আটকে পড়েছে। যারা আমাদের দেশের জন্য কেবল বোঝাই নয়, সৃষ্টি করেছে নানান সমস্যা। পাকিস্তান সরকার তাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে না। যদিও ফিরিয়ে নেয়া উচিৎ। পাকিস্তানের সাথে বাংলাদেশের এই নিয়ে একাধিক আলোচনা হয়েছে অথবা আজো হচ্ছে। এই সমস্যার কারণে পাকিস্তানের সাধারণ জনগণই এ সম্পর্কে ভাবছেন। তারাও সমস্যা নিয়ে দেখছেন। তাদের সঙ্গে আমাদের মতদ্বৈততা নেই। কিন্তু এই সমস্যার সমাধান করে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে আরো জোরালো করা সম্ভব হবে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ
জাফর আব্বাস: ঢাকা

www.pathagar.com

'প্রত্যেককে হত্যার কোন পরিকল্পনা আমাদের ছিলনা'

কর্ণেল (অবঃ) ফারুক রহমান

কর্ণেল ফারুকের ব্যাপারটি মনে হয় দ্বিতীয় কোন সভ্য জাতি কিংবা ইতিহাসে নেই। তিনি বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জনক শেখ মুজিবর রহমানের আত্মস্বীকৃত খুনি। বাংলাদেশে খুনি হিসেবেই তিনি পরিচিত। বর্তমানে ফ্রিডম পার্টির প্রধান হিসেবে বাংলাদেশের রাজনীতিতে সক্রিয়। ফ্রিডম পার্টির ভিত্তি হলো ১৫ই আগষ্ট ৭৫এর হত্যাকান্ড এবং সেই মনোবল বা স্পিরিট, যে রাতে স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জনককে হত্যা করে হত্যা ও ক্যু'র রাজনীতির সূচনা করা হয়েছে। তার ব্যাখ্যাকৃত 'বিপ্লবী কার্যক্রমের' ব্যাপারে তিনি এতোদিন যেখানে গর্ববোধ করতেন এখন ইউডেমনিটি বিল বাতিল হয়ে যাচ্ছে জেনে তার প্রতিক্রিয়াটি বেশ গুরুত্বের দাবি রাখে।

কর্ণেল ফারুক ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধকালীন পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে ছিলেন, ভাল উর্দুও শিখেছেন সেই সুবাদে। তার বহু সামরিক বন্ধু এখনো পশ্চিম-পাকিস্তান তথা বর্তমান পাকিস্তানে রয়েছে জানালেন। রাজনৈতিক বন্ধুতো অবশ্যই। বাংলাদেশ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেন, স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার দুই বছর পর থেকে স্বাধীনতার সব স্বপ্ন ধুলিসাৎ হতে থাকে। তিনি এসব অত্যাচার দুর্নীতি সম্পর্কে জানতেন এবং এই দুর্নীতি ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে কেবল সোচ্চার হয়েছিলেন মাত্র। এর জন্য তার সমসাময়িক সামরিক ও রাজনৈতিক বন্ধুরা আজো তাকে প্রতিবাদী হিসেবে চিহ্নিত করছেন। হত্যাকর্মের জন্য তিনি গৌরববোধ করে বর্তমান সরকারকে নানা অরাজকতার জন্য দায়ী করেন। যে সাক্ষাৎকারটি পত্রিকার জন্য নেয়া হয় তা এরকম:

প্রশ্ন: বিরোধী দল আওয়ামী লীগ সংসদে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিলের জন্য একটি বিল পেশ করেছে যা বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের বিচারকে তরান্বিত করবে। যদি ক্ষমতাসীন বিএনপি দল তা সমর্থন করে তখন কি শেখ মুজিবকে হত্যার দায়ে আপনি আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াবেন?

উত্তর: এনিয়ে যে যাই বলুক আমি এসবের কোন কিছুকে তেমন গুরুত্বের সঙ্গে বিচার করিনা। কেননা ইনডেমনিটি বিলে আমি একাই শুধু নই, আরো অনেকেই বিচারের জন্য আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। বর্তমান সরকারের মন্ত্রীদের অনেকেই সেই ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। তাদের কি হবে? উল্টো প্রশ্ন করে তিনি বলেন, স্বাধীনতা

www.pathagar.com

বিরোধী জামায়াত- আলবদর বাহিনীর বিরুদ্ধে স্বাধীনতার পর থেকে সাহাবুদ্দিন সরকার পর্যন্ত কে কি করছে? তারা আজও যুদ্ধপরাধী দেশদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কোন বিচার কিংবা শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারেনি। যদি আওয়ামী লীগ ও বিএনপি আমাকে কিছু করতে চায়? তাদের জানা আছে এর পরিণতি ভয়াবহ হবে, যার পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ অন্তত কারো পক্ষে সম্ভবপর নয়। আমি এজন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত নই। আমি যা ভাল মনে করি, তাই করি। তাছাড়া আমার সামরিক সহযোগীরাই তো রয়েছে । যদি সরকার আমার ব্যাপারে কোন উদ্যোগ নিতেন তাহলে অনেক আগেই নিতো।

প্রশ্ন: শেখ মুজিব ও তার পরিবারকে হত্যা করে বাংলাদেশের কি পরিবর্তন আপনি দেখছেন? অথবা কি পরিবর্তন হয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর: বর্তমানের এই দিনকে যদি রাজনৈতিক অগ্রগতি ধরা যায় তবে বলা উচিৎ হবে সেদিনের হত্যাকান্ড এই রাজনৈতিক অগ্রগতির সূচনা করেছে। চতুর্দিকে তাকালে বলা যায় যে, সেদিনের রাজনৈতিক নেতারা যেন নিভু নিভু প্রায়, প্রাণ শক্তি হারিয়েছে। যারা পুরাতন রাজনৈতিক ধারার মধ্যদিয়ে বেরিয়ে আসছে তারাও কোন উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারছে না তাই ১৫ই আগষ্টের হত্যাকান্ড এবং ঘটনাবলীকে আমি 'বিপ্লবাত্মক কর্মকান্ড' বলে অভিহিত করি, কখনো বিপ্লব হিসেবে নয়। গত ২০ বছরের অগ্রগতিকে বিপ্লবের ধারাবাহিকতা বর্ণনা করে তিনি আরো বলেন, যে বা যারা সেই বিপ্লবে বাধা হিসেবে দাড়িয়েছে, সে কিংবা তারা ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। বর্তমান বিএনপি সরকার সেভাবে অতীতের পথ অনুসরণ করছে। নির্দিধায় বলা চলে তার পতন অতি সন্নিকটে । তারপর হয়তো সামরিক শাসনের মধ্যদিয়ে অর্জিত সকল অগ্রগতির চাকা পেছনের দিকে সরে যাবে। এভাবেই আগের বছরগুলো পেরিয়েছে।

প্রশ্ন : তারপর ?

উত্তর : নতুন কোন প্রক্রিয়া আরম্ভ হবে। সেই জন্য ফ্রিডম পার্টি নিজের কর্মসূচিকে ভবিষ্যতের জন্য এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। যা দ্বারা সেই সংকট মোকাবেলা করা যায়।

প্রশ্ন : অনেকেই এই অভিযোগ করেন যে, আপনি এবং আপনার সঙ্গী সামরিক সতীর্থরা শেখ মুজিবকে তার গৃহীত পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে যেতে দেননি বরং মেরে তার চেতনাকে ধুলিসাৎ করেছেন। আপনি এ সম্পর্কে কি ভাবেন, আপনার অভিমতই বা কি?

www.pathagar.com

উত্তর: শেখ মুজিবকে প্রচুর ও পর্যাপ্ত সময় দেয়া হয়েছে। আজ সুস্পষ্ট যে, কোন আওয়ামী লীগ কর্মী মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেননি, তাছাড়া তারা মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে ততো কঠোর ছিলনা। এখনো মুক্তিযুদ্ধ চলছে, মুক্তিযুদ্ধকে কেবল ৯ মাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা চলবেনা। প্রকৃত পক্ষে ভারত আওয়ামী লীগকে ব্যবহার করে নিজের ফায়দা লুটার চেষ্টা করছে।

প্রশ্ন: আপনি বলছেন, শেখ মুজিব রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে ধ্বংস করে ফেলেছিলেন, সেটি কি রকম ? বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঐতিহ্যের আলোকে ব্যাখ্যা করবেন কি?

উত্তর: সেটি কি রকম?

প্রশ্নঃ যেমন ধরুণ রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের ধারা, অভ্যুত্থান, পাল্টা অভ্যুত্থান এবং সামরিক শাসন।

উত্তর: আমি এই ভেবে আত্মতুষ্টি পাই যে, আমি আজও বাংলাদেশে বাস করি। বাংলাদেশে অন্তত এখন যে অবস্থা বিরাজমান তাতে। কিন্তু তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার আজও ক্ষমতায় থাকলে বাংলাদেশ আর একটি সিকিম এ পরিণত হতো।

প্রশ্ন: আপনার কার্যক্রমের পেছনে কোন অনুপ্রেরণা উদ্দেশ্য ও দর্শন কাজ করেছিল বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর: হত্যাকান্ড কোন ষড়যন্ত্র নয়। আমি ব্যক্তিগতভাবে হত্যাকান্ডের বিরোধী, আমি জানি, মুজিব তার নিজগুণে দেশের প্রধান হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি যখন ভারতের সঙ্গে মৈত্রীচুক্তি করে ভারতের চর হিসেবে বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছিলেন তখন মুজিবের নেতৃত্বে তৎকালীন আওয়ামী সরকার নিজ স্বার্থে ঢালাওভাবে সংবিধানের পরিবর্তন করে যাচ্ছিলেন। তখনি আমাদের সৈন্যরা মুজিবের বাড়ি আক্রমণ করে, গুলিবর্ষণ শুরু করে, কিন্তু সেসময় মুজিবের ছেলে আমাদের দিকে গুলিবর্ষণ করে। কিন্তু আমাদের সৈন্যরা সে রাতে শেখ মুজিবের পরিবারের সকলকে হত্যা করার জন্য আক্রমণ করেনি।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ:
জাফর আব্বাস, করাচী

www.pathagar.com

বিএনপি ও আওয়ামী লীগের রাজনীতি সম্পূর্ণরূপে বিপরীত না হলেও তাতে রয়েছে দুস্তর ব্যবধান

আব্দুস সালাম তালুকদার
মহাসচিব, বিএনপি

প্রশ্ন: স্বাধীনতার বিশ বছর অতিক্রম হয়েছে, আপনি কি মনে করেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে ঘিরে বাঙালী জনগণের যে স্বপ্ন ছিল তা বাস্তবায়িত হয়নি ? না হলে কেন?

উত্তর: বাংলাদেশের জনগণ তাদের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের সময় যে আকাঙ্খায় একত্রিত হয়েছিল তা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে তা বলা যাবেনা। কেননা ৯ বছর ধরে আমরা স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন করে সরকারের পতন ঘটিয়েছি, এ কথাতো অস্বীকার করার জো নেই। আমরা এখন অন্তত গণতন্ত্র চর্চার পথকে সুগম করেছি। তবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এখনো স্থায়ী রূপ পেতে পারেনি কিংবা পায়নি। আপনি দেখবেন '৭৫ এর পর থেকে '৮২ সাল পর্যন্ত ক্ষমতাসীন বিএনপি সরকার বিশ্বব্যাংক এর ৩৫% সম্পদ জাতীয় উন্নয়নে কাজে লাগিয়েছে। আসলে সেই অর্জন জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি সরকারের জন্যই। ঐ ক'বছরের অর্জন ১৯৪৭-৭১ সালের অর্জনকেও ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু এরশাদের স্বৈরাচারী আমলে ১০০% বিদেশি ঋণ আনা সত্ত্বেও সামান্যতম উন্নয়নও হয়নি। বরং বলা চলে জিয়া সরকারের উন্নয়নের চাকাকে পিছু ঠেলে দিয়ে পুরো উন্নয়ন বিষয়টিকে হাস্যকর করে ফেলেছে। অবশ্য বর্তমানে অন্যান্য বিষয়কে বিচারে না এনে কেবল রাজনীতির ক্ষেত্রে সংসদীয় পদ্ধতির গণতন্ত্রের কথা চিন্তা করা হলে বলা যায় আমরা অন্তত গণতন্ত্র আনতে পেরেছি। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের চাকাকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য পদক্ষেপ নিচ্ছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালু থাকলে আমরা আমাদের অর্থনীতির ভিতকে সুদৃঢ় করতে পারবো।

প্রশ্ন: এটা সবাই জানে যে, জেনারেল জিয়া সামরিক শাসক থাকাকালীন বিএনপি গঠিত হয়েছে। বলা যায় গঠন করা হয়েছে। সামরিক শাসক হয়ে কিভাবে তিনি দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় থাকেন, এবং কিভাবে একটি সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার নির্বাচিত হয়েছিল?

www.pathagar.com

উত্তর: এটা অস্বীকার করার জো নেই যে, বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা হলেন একজন সামরিক বাহিনীর লোক। কিন্তু একথা তো অস্বীকার করতে পারবোনা যে. তিনি স্বাধীনতা যুদ্ধের একজন বীর সৈনিক-মুক্তিযোদ্ধা। যিনি ১৯৭১ সালের ২৬ ও ২৭ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন। তাছাড়া ব্যক্তিগতভাবে তার চরিত্র ছিল অত্যন্ত পুত-পবিত্র। বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণসহ বিরোধী দলের কাছে জিয়াউর রহমান ছিলেন একজন সৎ ও যোগ্য লোক. তাছাড়া একজন নিঃস্বার্থ মুক্তিযোদ্ধা। তার এই নেতৃত্ব-গুণ সামরিক বাহিনীতে থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক দলগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলো। তাছাড়া সামরিক অফিসার হিসেবে তার কোন অযোগ্যতা কখনো ছিলনা। ফলে জিয়াউর রহমান যে রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেছেন জনগণ তা কায়মনোবাক্যে মেনে নিয়েছেন। দলে দলে বিএনপিতে এসে তাদের আস্থা রেখেছেন। সমসাময়িক কালে এতদ-অঞ্চলে যে গুরুত্বপূর্ণ দুই পার্টি ও প্রতিভাধর ছিলেন তার মধ্যে ইন্দিরা গান্ধী ও বেগম খালেদা জিয়া বেশ জনপ্রিয়। তবে জিয়াউর রহমানের জীবদ্দশায় তিনি স্ত্রী হিসেবে ঘরে ছিলেন, রাজনৈতিক নেত্রী হিসেবে পরিচিতা ছিলেন না। কিন্তু ১৯৮১ সালে জেনারেল জিয়ার দুঃখজনক হত্যাকান্ড এবং স্বৈরাচারের উত্থান তাকে রাজনীতিতে আসার জন্য অনেকটা বাধ্য করে: এই বাধ্যবাধকতা ছিল বিএনপি'র সমর্থকদের।

প্রশ্ন: আপনি বলছেন, জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার প্রথম ঘোষক অপরদিকে বিরোধী দল আওয়ামী লীগ তাকে ইতিহাস বিকৃতি বলে দাবি করছেন। এমনকি দেশের বরেণ্য বুদ্ধিজীবীরাও এই বিষয়টিকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেন। এটা মুক্তিযুদ্ধে দুই পরস্পর বিরোধী দলের নেতাদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধে কার ভূমিকা বড়ছিল তা প্রমাণের ব্যর্থ চেষ্টা নয় কি?

উত্তর: আপনি যাদের কাছে যাবেন তারা কোন না কোন রাজনৈতিক মতের অনুসারী, এবং তারা চায় স্বাধীনতাযুদ্ধে কার ভূমিকা বেশি ছিল তা প্রমাণ করতে। কিন্তু এতো সত্যি যে, প্রেসিডেন্ট জিয়া তথা তৎকালীন মেজর জিয়া ১৯৭১'র ২৬ ও ২৭ মার্চ এ স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘোষণা দেয়। এটিই বাস্তব সত্য এবং এটাই ইতিহাস। তবে যে কেউ যেকোন ধরনের কথা বলতে পারে ইতিহাসতো মিথ্যা হতে পারে না।

প্রশ্ন: আপনার মতো বঙ্গবন্ধুশেখ মুজিবর রহমানের কন্যা তথা আজকের বিরোধী দলের নেত্রী অভিযোগ করেছেন যে, তার পিতাকে ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে ফেলার জন্য ইতিহাস বিকৃত করা হচ্ছে। আপনি এ সম্পর্কে কি বলেন?

www.pathagar.com

উত্তর: আমি জানিনা শেখ মুজিবকে কখনো জাতির পিতা ঘোষণা দেয়া হয়েছে কিনা? অথবা আদৌ কেউ ডেকেছেন কিনা। আর ইতিহাস বিকৃত করার কোন কারণ তো দেখতে পাইনা।

প্রশ্ন: আপনি বলছেন এরশাদ একজন স্বৈরশাসক অথচ আজ দেশে চলছে অবাধ গণতন্ত্র। সেখানে অন্যান্য পার্টির মতো জাতীয় পার্টি গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগ করতে পারছেনা এব্যপারে আপনার অভিমত কি?

উত্তর: ক্রিমিন্যালদের কোন জায়গা নেই। সন্ত্রাসীদের সাথে আমাদের কোন আপোষ নেই। আইনের দৃষ্টিতে তারা অপরাধী ও ক্রিমিন্যাল। তাছাড়া সরকারি গণমাধ্যম তাদের কোন খবর প্রচারে বাধ্য নয়।

প্রশ্ন: আওয়ামী লীগ শেখ মুজিব হত্যার বিচারের দাবিতে সংসদে ইনডেমনিটি বিল আনছে। এই বিলের উপর বিএনপির সমর্থন ও বিরোধীতা আগামী দিনের গণতান্ত্রিক রাজনীতির ধারা নির্দেশিত করবে, বিশেষজ্ঞজনের এই অভিমত। এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি?

উত্তর: আপনিতো দেখছেনই বিএনপি ও আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক ব্যবধান বিস্তর। এটি 'ইনডেমনিটি বিল' নিয়ে নয়। এটি পাশ করি কিংবা না করি, আওয়ামী লীগ ও বিএনপি কখনো এক স্রোতে আসতে পারবে না। অতএব ইনডেমনিটি বিল সমন্বিত রাজনীতির কোন ধারা সৃষ্টি করবেনা। এতোদিন ইনডেমনিটি বিল নিয়ে কথা উঠেনি আর আওয়ামী লীগের সাথে বিএনপির সম্পর্ক অতীতের তুলনায় বর্তমানে ইতিবাচক - কই এমনতো দেখছিনা।

প্রশ্ন: আপনি আত্মোন্নয়নের জন্য বিরোধী দলের অংশগ্রহণ দরকার বলে স্বীকার করেছেন, আপনার নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া কি এ ব্যাপারে বিরোধীদলকে সহযোগিতার জন্য ডাকবেন?

উত্তর: যদি সবাই সত্যিকার ভাবে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য চেষ্টা করেন তবে সমস্ত বিভেদ ভুলে গিয়ে এগিয়ে আসা ছাড়া উপায় নেই।

www.pathagar.com

আমার মধ্যে জালিমের কোন অস্তিত্ব নেই

জেনারেল (অবঃ) টিক্কা খান

প্রশ্ন: ১৯৭১ সালে বাঙালীদের বিরুদ্ধে আপনার সিদ্ধান্তের জন্য আপনি বাঙালীদের কাছে 'জালিম' নামে ধিকৃত। বিশ বছর পর এ সম্পর্কে আপনার এ প্রসঙ্গে কিছু উত্তর আশা করছি।

উত্তর: আমি তীব্র ভাষায় 'জালিম' শব্দটিকে প্রত্যাখ্যান করি। এই প্রশ্নের জবাবে আমি বলছি "বুচার বা জালিম" শব্দটি আগে পরিস্কার করা প্রয়োজন। বেলুচিস্তানে সামরিক পদক্ষেপ নেয়াকে আমার ভাষায় "জালিম" বলা হয়। বেলুচিস্তানের কাজে আমি কখনোই ছিলাম না। তাছাড়া মন্দ লোকজন আমার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করার হীন স্বার্থে শব্দটিকে আমার নামের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে। আমাকে পূর্ব পাকিস্তানের হাজার-লক্ষ বাঙালী হত্যার জন্য দায়ী করা হয় এটাও সত্য নয় । তারা না জেনে আমার সম্পর্কে এ ধরনের ধারণা পোষণ করে। এ প্রজন্ম আমাকে ঘৃণার সঙ্গে দেখে এ নিয়ে আপনার (সাংবাদিকের) কাছে আমি সবিস্তারে ব্যাখ্যা করছি। আসলে পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন ভয়াবহ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শান্তি শৃংখলা ফিরিয়ে আনার জন্য আমাকে সেই সিদ্ধান্ত নিতে হয় । এতে প্রমাণিত হয় না যে আমার মধ্যে কোন জালিমের অস্তিত্ব আছে।

আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলবো অন্তত এই মুহূর্তে এ সম্পর্কে আমার কিছু বলার নেই । কেবল তখন পূর্ব-পাকিস্তান সরকারের সামরিক প্রধান হিসেবে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক কাজ করেছিলাম। আমি কেবল প্রেসিডেন্টের নির্দেশ মেনেছিলাম। একইভাবে যুদ্ধের ক'দিনপর আমি পাকিস্তানে ফিরে আসলে পাকিস্তান সরকার এবং তখনকার উচ্চপদস্থ অফিসারেরা পাকিস্তান সরকারের পক্ষে বাস্তবোচিত ও যথাযথ ভূমিকা পালনের জন্য আমাকে বাহবা দেন। পাকিস্তানের নিরাপত্তার জন্য আমাকে তারা যথোপযুক্ত বলে অভিহিত করেন। আমি যখন বিমানে করে লাহোরে পৌঁছি তখন তৎকালীন প্রধান বিচারপতি প্রশংসার সঙ্গে বলেছিলেন, "পাকিস্তানকে রক্ষা করার জন্য আপনার ভূমিকা পাকিস্তানবাসীরা আজীবন মনে রাখবে। আমি বলছি পাকিস্তানীদের কাছে আপনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।" আমি তাকে বলেছিলাম "পাকিস্তান আজও নিরাপদ নয়, আমার কাছে তখন পূর্ব ও পশ্চিম উভয় পাকিস্তান ছিল এক। পাকিস্তান আলাদা হোক সত্যিকারভাবে মনে প্রাণে আমি তা চাইনি। "আসলে আমি এবং আমার সহযোগী সিনিয়র অফিসাররা তৎকালীন সরকারের সিদ্ধান্তকে মেনে নিয়ে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।"

www.pathagar.com

প্রশ্ন: পাকিস্তান আর্মিরা বলেন যুদ্ধকালীন আপনি স্বৈরাচারের মতো সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এটি কি সামরিক বাহিনীর ভেতরে আপনার নেতৃত্বের দুর্বলতা ছিল। এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি?

উত্তর : আমার পক্ষ থেকে ঐ রকম কোন সিদ্ধান্ত কিংবা নির্দেশ কখনো তখন দেখা হয়নি। আমার সময় নারী নির্যাতন ও ধর্ষণ সংক্রান্ত কোন ঘটনা ঘটেনি। তবে জনৈক পাকিস্তানী সৈন্য কর্তৃক একজন মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগ পাওয়া গিয়েছিল। পরে দেখা গেল সেই মহিলা পাকিস্তানী। একজন বাঙালী কর্ণেল এই অভিযোগ করার পর আমি সেই ধর্ষণকারী পশুটির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছিলাম। কিন্তু এই সৈন্যের শাস্তি দানের ঘটনাকে আজও জানানো হয়নি।

আমার সময়ে সর্বসাকুল্যে ৬২ জন মেয়ে ধর্ষণের অভিযোগ এনেছে। এটা কেবল মিথ্যা প্রচার যে, আমি এই সমস্যা সমাধানের জন্য বাঙালী নিধন ও নারী ধর্ষণের ঘোষণা দিয়েছিলাম। তবে এই ৬২ জনের অভিযোগ পেয়েছি বিদেশি পত্রিকা থেকে। কিন্তু আজও আমি সেই তথ্য বিশ্বাস করিনা এবং কখনো করবোনা। আমরা চাইনি পূর্ব-পাকিস্তান মূল পাকিস্তান থেকে আলাদা হোক। কিন্তু বাঙালীরা '৭১ এর আগে থেকেও পাকিস্তান ভেঙ্গে আলাদা করতে চেয়েছে। আন্দোলন করে সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করেছে। এজন্য আমাদের এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়া ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ ছিলনা। আমি আর্মি অফিসার হিসেবে মনে করি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট শাহাজাদা আইয়ুব খানের শাসনে কিছুটা ত্রুটি-বিচ্যুতিও লক্ষ্য করা গিয়েছিল সেসময়। আমি সেই বিচ্যুতিটি কেবল শোধরাতে চেয়েছি এবং প্রয়োজনে তা বল প্রয়োগ করে হলেও। ৬ মাস পরে আমি ফিরে আসলেও সেই ৬ মাসে আমার কার্যকলাপের জন্য আমি খুবই খুশি এবং তা বেশ কয়েক জায়গায় প্রশংসিত হয়েছে।

প্রশ্ন: আপনি মি. ভুট্টোর অধীনে *Cuos* এবং পরে তার পার্টির সদস্যও হয়েছেন। পাকিস্তান ভাঙ্গার ব্যাপারে ভুট্টোর ভূমিকা কি ছিল, মূল্যায়ন করুন।

উত্তর: এই প্রশ্নের উত্তরে প্রথমেই আমি বলবো যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন পাকিস্তানকে বিভক্ত করে পাকিস্তানের শক্তি খর্ব করতে চেয়েছিল। ভুট্টোইতো বলেছিলেন 'ইধার হাম, ওধার ফাম' (এই অঞ্চল আমাদের আর ঐ অঞ্চল তাদের) এই ধরনের কথা ভুট্টো কখনো বলেননি আমার দৃঢ় বিশ্বাস পত্র-পত্রিকা এগুলোকে নিয়ে অপপ্রচার করেছে। পত্র-পত্রিকায় উদ্দেশ্যমূলকভাবে বলা হয়, ভুট্টো পশ্চিম পাকিস্তানে এবং শেখ মুজিব পূর্ব

www.pathagar.com

পাকিস্তানে একক সখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে। ভুট্টো মূলতঃ ক্ষমতার ভাগাভাগি চেয়েছিলেন, এটাতে আমি দোষের কিছু দেখিনা। ভুট্টোকে পাকিস্তান ভাঙ্গার জন্য কিছুতেই দায়ী করা চলেনা বরং ইয়াহিয়া খানের সৈন্যদেরকে পাকিস্তান ভাঙ্গার জন্য দায়ী করা যায়। যখন আমি আর্মি চীফ হই তখন ভুট্টোর কার্যকলাপ সবসময় ছিল পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতির পক্ষে, আমার মনে হয়েছে। বাংলাদেশ ভূমি প্রতিষ্ঠার দাবি তার সহ্য হয়নি। চীনারা তাকে *Army Action* নিতে বাধ্য করেছে। এমনকি '৭৩ সালে লাহোরে যখন ইসলামী দেশ পাকিস্তানকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য চাপ দিতে থাকে যে, বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র, তখন শেখ মুজিবকে পাকিস্তানে নেয়া হয় এবং বাংলাদেশ পায় তার সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি। আবার বাংলাদেশকে যখন কমনওয়েলথ এর সদস্য ভুক্ত করা হয় তখন ভুট্টো পাকিস্তানের সদস্য পদ প্রত্যাহার করে নেয়। আমি মনে করি শেখ মুজিব ও ভুট্টো এই দুজনের কারণেই পাকিস্তান দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে মুজিব ও বাঙালীরাই মূলতঃ দায়ী, কেননা বাঙালীরা এতো চরম পর্যায়ে চলে গিয়েছিল যে, ভুট্টোর উপায় ছিলনা পাকিস্তান রক্ষা করবে, ভুট্টো শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনায় বসেছেন, পাকিস্তানের শেষ রক্ষার চেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু মুজিব তার কোন প্রস্তাব তোয়াক্কা না করে বাঙালীদের উস্কে দিয়েছে। ভুট্টো নয় বরং শেখ মুজিবই পাকিস্তানকে দুইভাগে ভাগ করেছে, পাকিস্তান ধ্বংসের জন্য অন্যতম দায়ী ব্যক্তি এই মুজিবই।

সাক্ষাতকার গ্রহণ: ইহ্তা শামুল হক

www.pathagar.com

বাংলাদেশ সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট, জার্নালিজম এন্ড কমিউনিকেশন (বিসিডিজেসি) একটি অমুনাফামুখী বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। ১৯৯১ সাল থেকে উন্নয়ন, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিসিডিজেসি কাজ করে যাচ্ছে। একটি নিরাপদ, গণতান্ত্রিক, শান্তিময় বিশ্ব গড়ে তুলতে এবং ব্যক্তির মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় যোগাযোগ ও গণমাধ্যমের ভূমিকা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিসিডিজেসি শিক্ষা, গবেষণা, প্রশিক্ষণ, প্রকাশনা ও পরামর্শ সেবার মাধ্যমে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতার সকল সম্ভাবনার সম্ভব সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে সে অগ্রযাত্রার শরীক হতে অঙ্গীকারবদ্ধ। বিসিডিজেসি'র কার্যক্রম মানুষের মুক্তি, ক্ষমতায়ন, কল্যাণ ও সমৃদ্ধি অর্জনের নিরন্তর প্রচেষ্টায় নিবেদিত।

জন্ম ১৯৭০ এর পহেলা জুন চট্টগ্রাম জেলার মহালংকা গ্রামে। দুরন্ত আর আত্মপ্রত্যয়ী চরিত্রে লেখকের শৈশব কেটেছে গ্রাম আর শহরে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতায় এম, এ করে দৈনিক রূপালীর মধ্যদিয়ে পেশা সাংবাদিকতা ও লেখালেখির যাত্রা শুরু, সংবাদ সংস্থা ইউ.এন.বি এবং বাংলাদেশ টেলিভিশনে সাংবাদিকতার ভিন্নধর্মী অভিজ্ঞতা তাঁকে লেখার দিগন্ত প্রসারে সহায়তা করেছে। তিনি গণমাধ্যম নিয়েই বিশেষতঃ স্যাটেলাইট ভিত্তিক বিশ্ব সম্প্রচার ও যোগাযোগ নীতি নিয়ে লেখালেখি করেন। এখন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক। অদম্য আগ্রহ আর এক ধরনের নেশার মতো লিখবেন- এই প্রেরণায় বেঁচে থাকার ইচ্ছে।

ISBN-984-8158-03-2